শুকতারা

স্বর্ণখনির অন্তরালে

ষট্‌চত্বারিংশৎ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ • ১৪০০

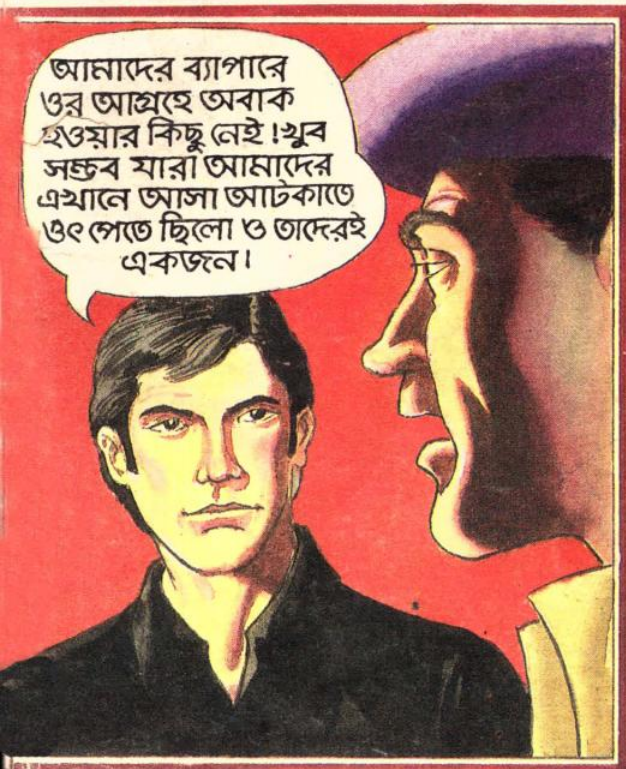

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - পৌষালী পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় কমিকস্ 'ডায়মন্ড কমিকস'
প্রতি মাসে প্রকাশ করছে চাচা চৌধুরী,রমন, বিল্লু,
পিঙ্কী, আর ফ্যান্টমের নিত্যনতুন
এবং আকর্ষণীয় কান্ডকারখানা।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র চাচা চৌধুরী ওনার কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর বুদ্ধির জোরে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। জুপিটারবাসী অসীম শক্তিমান সাবু ওনার প্রধান সাহায্যকারী। শক্তি ও বুদ্ধির এই অপূর্ব সংমিশ্রণ তোমাদের আনন্দ দেবে।

মধ্যবিত্ত কেরাণীর সমস্যা-গুলোর সঙ্গে অনবরত লড়াই চালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে আনন্দও দিয়ে আসছে কার্টুনিষ্ট প্রাণের অদ্ভুত চরিত্র রমন। পেটে খিল ধরিয়ে দেবার মত হাসিতে ভরপুর রমনের নতুন কমিকস্।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি পিঙ্কী ওর দাদু আর ঝপটজীকে সঙ্গে নিয়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত কান্ডকারখানা করে তোমাদের তো বটেই, অত্যন্ত গোমড়া-মুখোদেরও মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলছে।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি চঞ্চল চরিত্র বিল্লু ওর সঙ্গীসাথী গান্দু, জোজি আর বজরঙ্গী পালোয়ানকে নিয়ে তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য বুকষ্টলে হাজির হয়ে গেছে।

সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ফ্যান্টম-এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো সবার কাছে সমান মনোরঞ্জক। প্রাচীন কাল থেকে বংশানুক্রমে অসহায়ের বন্ধু এবং অপরাধীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূত' ফ্যান্টমের সৃষ্টিকর্তা শ্রী লী ফক্।

ডায়মন্ড কমিকস্-এর নবতম নিবেদন

ব্রহ্মান্ডের অধিপতি 'হী-ম্যান' এখন বাংলাতেও ডায়মন্ড মিনি কমিকসে প্রকাশিত হয়েছে!

সংখ্যা ঃ 1-12

প্রতি সংখ্যার মূল্য ঃ 3/-

বিশ্ববিখ্যাত কমিকস্ 'স্পাইডার-ম্যান' এখন বাংলাতেও! সংখ্যা 1-2 স্টলে হাজির হয়ে গেছে।

মূল্যঃ 8/-

স্টীকার ফ্রী

DIAMOND COMICS (P) LTD.

2715, Darya Ganj New Delhi-110 002.

DISTRIBUTORS **VISHAL BOOK CENTRE** 4 TOTTEE LANE CALCUTTA-16

বাঁটুল দি গ্রেট

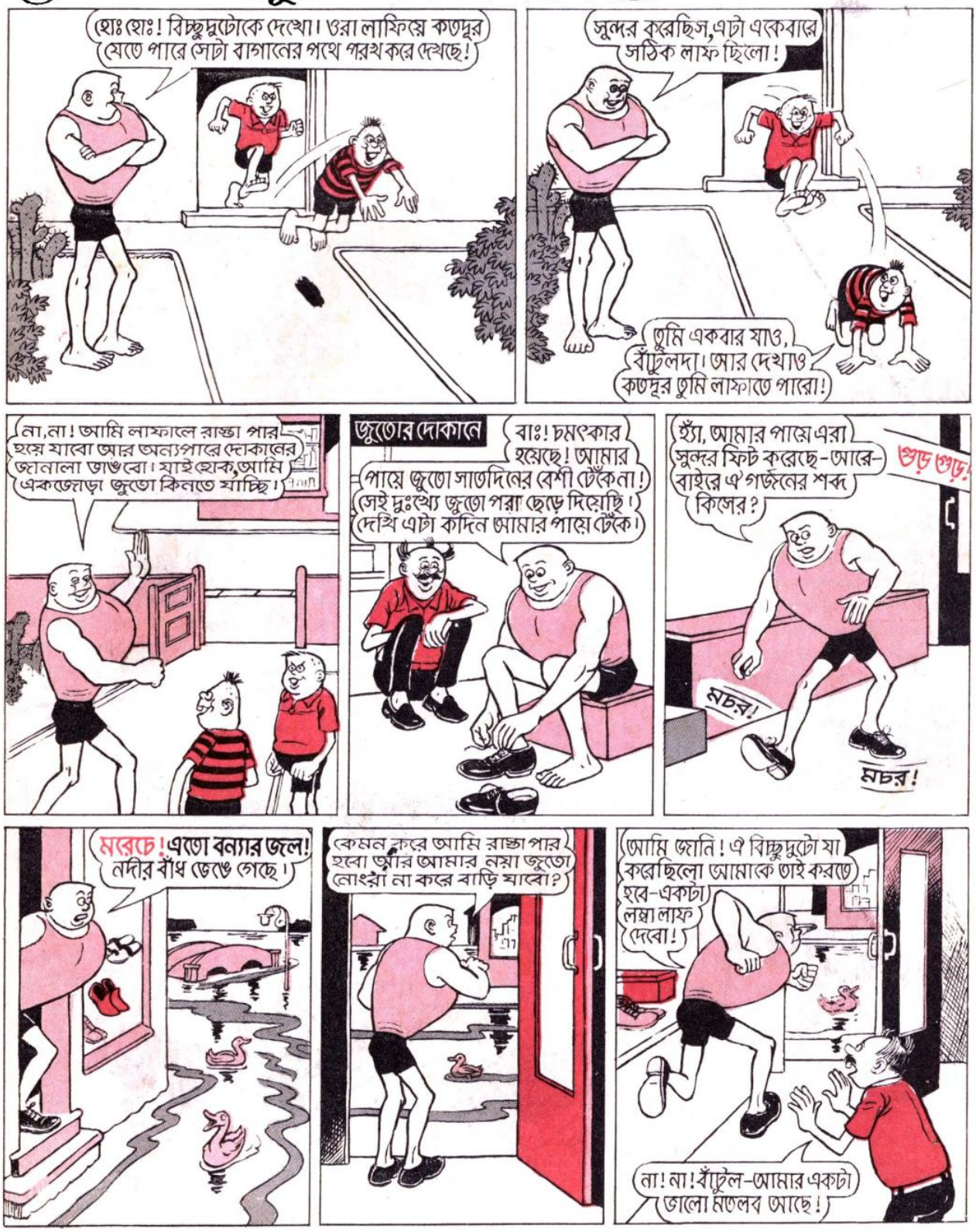
হোঃ হোঃ! বিচ্ছুদুটোকে দেখো। ওরা লাফিয়ে কতদূর যেতে পারে সেটা বাগানের পথে পরখ করে দেখছে!
সুন্দর করেছিস,এটা একেবারে সঠিক লাফ ছিলো!
তুমি একবার যাও, বাঁটুলদা। আর দেখাও কতদূর তুমি লাফাতে পারো!
না,না! আমি লাফালে রাস্তা পার হয়ে যাবো আর অন্যপারে দোকানের জানালা ভাঙবো। যাই হোক,আমি একজোড়া জুতো কিনতে যাচ্ছি।
জুতোর দোকানে
বাঃ! চমৎকার হয়েছে! আমার পায়ে জুতো সাতদিনের বেশী টেঁকেনা! সেই দুঃখ্যে জুতো পরা ছেড়ে দিয়েছি! দেখি এটা কদ্দিন আমার পায়ে টেঁকে।
হ্যাঁ, আমার পায়ে এরা সুন্দর ফিট করেছে-আরে-বাইরে ঐ গর্জনের শব্দ কিসের?
গুড় গুড়!
মচর!
মচর!
মরেচে! এতো বন্যার জলে! নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে।
কেমন করে আমি রাস্তা পার হবো আর আমার নয়া জুতো নোংরা না করে বাড়ি যাবো?
আমি জানি! ঐ বিচ্ছুদুটো যা করেছিলো আমাকে তাই করতে হবে-একটা লম্বা লাফ দেবো!
না! না! বাঁটুল-আমার একটা ভালো মতলব আছে!

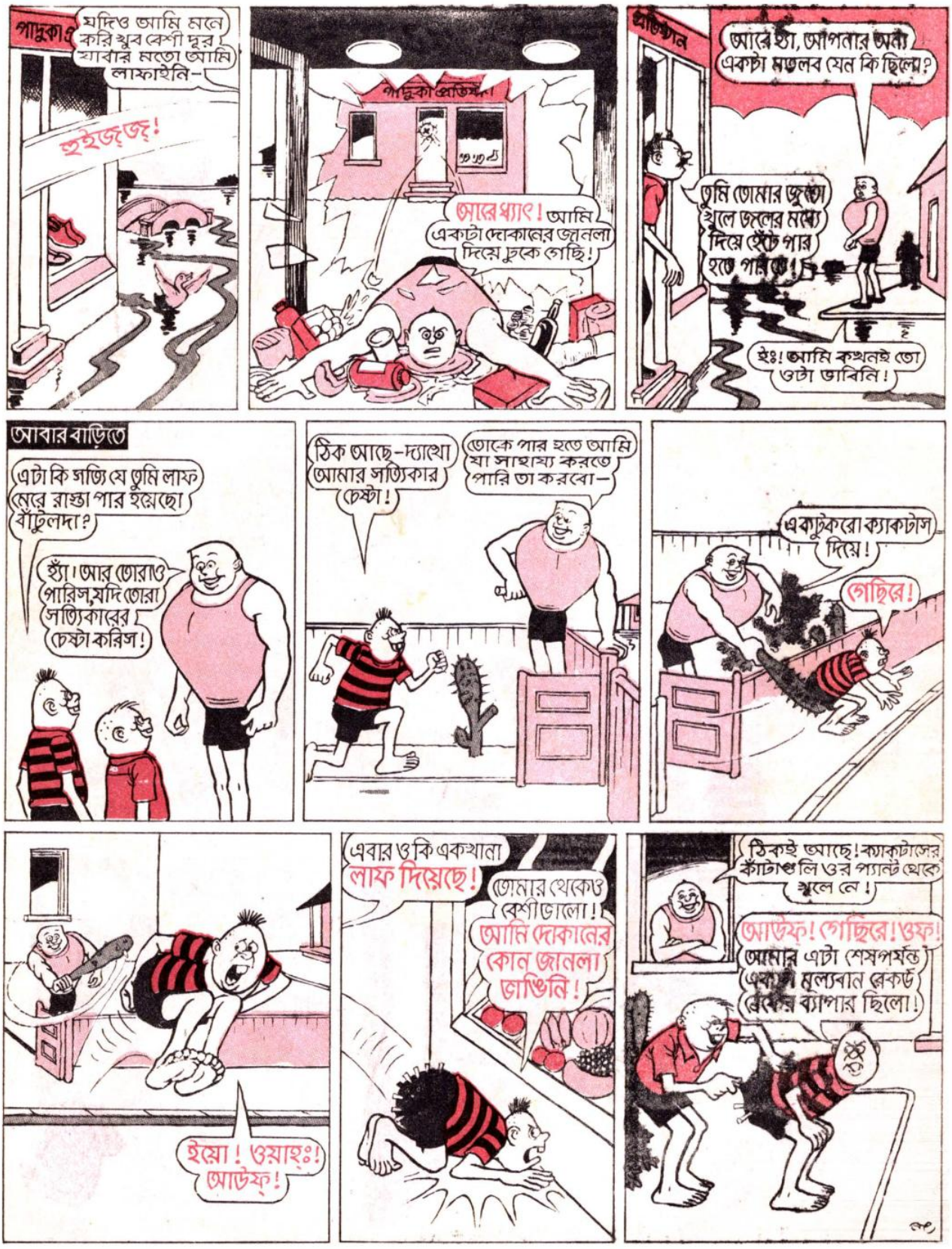

পাদুকা প্র
যদিও আমি মনে করি খুব বেশী দূর যাবার মতো আমি লাফাইনি–
হুইজ্‌জ্‌!
পাদুকা প্রতিষ্ঠান
আরে ধ্যাৎ! আমি একটা দোকানের জানলা দিয়ে ঢুকে গেছি!
প্রতিষ্ঠান
আরে হাঁ, আপনার অন্য একটা মতলব যেন কি ছিলো?
তুমি তোমার জুতো খুলে জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে পার হতে
ইঃ! আমি কখনই তো ওটা ভাবিনি!
আবার বাড়িতে
এটা কি সত্যি যে তুমি লাফ মেরে রাস্তা পার হয়েছো বাঁটুলদা?
হ্যাঁ। আর তোরাও পারিস, যদি তোরা সত্যিকারের চেষ্টা করিস!
ঠিক আছে–দ্যাখো আমার সত্যিকার চেষ্টা!
তোকে পার হতে আমি যা সাহায্য করতে পারি তা করবো–
একটুকরো ক্যাকটাস দিয়ে!
গেছিরে!
ইয়ো! ওয়াহঃ! আউফ্‌!
এবার ও কি একখানা লাফ দিয়েছে!
তোমার থেকেও বেশী ভালো!
আমি দোকানের কোন জানলা ভাঙিনি!
ঠিকই আছে! ক্যাকটাসের কাঁটাগুলি ওর প্যান্ট থেকে খুলে নে!
আউফ্‌! গেছিরে! ওফ্‌!
আমার এটা শেষপর্যন্ত মূল্যবান রেকর্ড ব্যাপার ছিলো!

শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

জ্যৈষ্ঠ ১৪০০
মে ১৯৯৩

প্রচ্ছদ □
স্বর্ণখনির অন্তরালে
—নারায়ণ দেবনাথ
শ্রদ্ধাঞ্জলি □
পরিব্রাজক বিবেকানন্দ
—স্বামী মুক্তিকামানন্দ ৫০
সম্পূর্ণ উপন্যাস □
ভোলু ওঝার সর্পজড়ি
—সুশীলকুমার সিংহ ২০
ধারাবাহিক □
অরণ্যপতি টারজান (অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী)—সব্যসাচী ৩২
জঙ্গল রহস্য (উপন্যাস)
—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৬
গল্প □
কাজের মেয়ে
—সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ১০
ভূতের গল্প □
নন্দলাল—গার্গী গঙ্গোপাধ্যায় ৩৫
হাসির গল্প □
আমবাগানে ঘোৎনা—অরুণ দে ১৩
রূপকথার গল্প □
ডাইনীরা বড় নিষ্ঠুর
—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭
অনুবাদ গল্প □
স্নেহের ছায়ায় মৃত্যু—অর্ঘ্য দাশ ৪১
জীবন থেকে নেওয়া □
জোজোর বায়না—আরতি বসু ৭০
পুরস্কৃত গল্প □
বিশালাক্ষ্মী মন্দিরে (প্রথম)
—বীথিকা দাশ ৬৫
মানুষ (দ্বিতীয়)—সুব্রত পণ্ডিত ৬৫
অগ্নিযুগের সৈনিক □
প্রথম শহীদ প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী
—চরণ দাস ৪৪
ফিচার □
স্বদেশী মোটর গাড়ি
—বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯
ভবিষ্যতের ঠিকানা
—অসিতকুমার চৌধুরী ৪০
বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ৬৩
বিশ্ববিচিত্রা □
জিজ্ঞাসা ৬৭
সত্যি! ৬৪

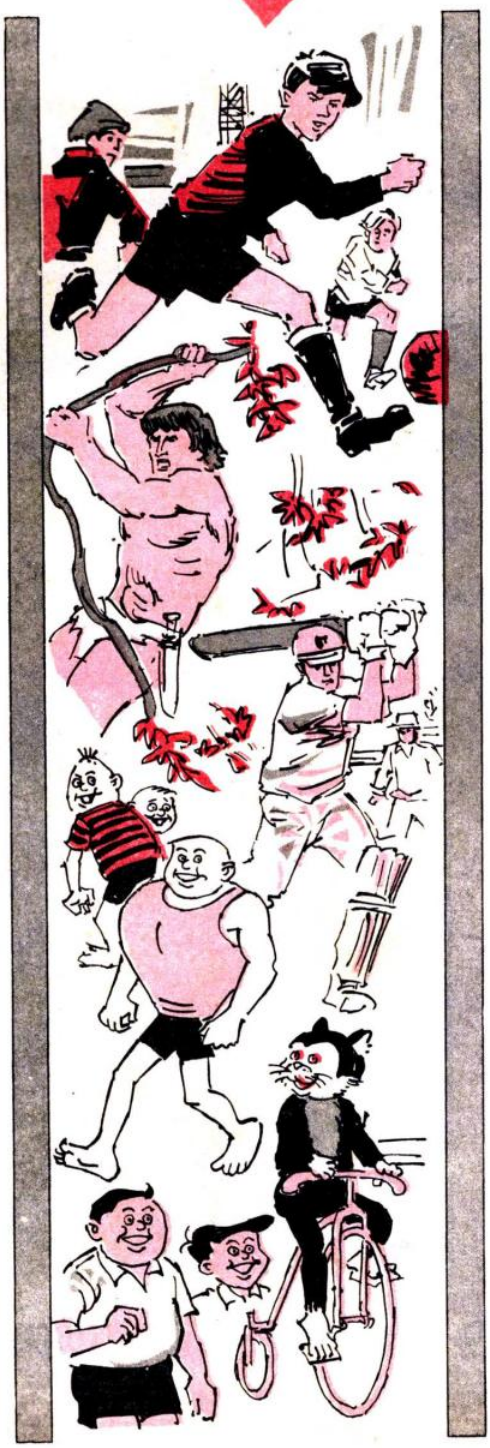

কবিতা □
পেটকাটা ডাক্তার—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫
স্বপনবুড়ো—অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ৩৯
রিপোর্টার—নিখিল তরফদার ৪৭
বিভাগীয় লেখা □
খেলা—শা. প্রি. ব. ৫৩
ক্লাব পরিচিতি—সুমন ভট্টাচার্য ৬০
পড়ার সঙ্গে খেলা—চন্দন রুদ্র ৬১
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম—তুষার শীল ৬২
দাদুমণির চিঠি ১৫
তোমাদের পাতা ১৬
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ৪৫
ছবিতে গল্প □
বিদ্যালয়ে বিভ্রাট (রঙিন)
—ময়ূখ চৌধুরী ১৮
বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন)
—নারায়ণ দেবনাথ ১
হাঁদা-ভোঁদা —নারায়ণ দেবনাথ ৪৮
বিলির বুট (রঙিন) ৬৮
ভয়ঙ্করের মোকাবিলায়
ম্যাম'জেল এক্স ৩০
ঘোষণা □
'স্বামী বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি' সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৫২
জানো কী ৬০

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456 (17)-T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - হাতে নিলে ৯০ টাকা।
ডাকে ঃ বুক পোস্টে - ১১০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ১৭০ টাকা।
Annual Subscription
Bangladesh— **Rs. 235.00**
U.K. and U.S.A.— **By Sea Mail Rs. 327.00**
By Air Mail Rs. 552.00

R.N.I.
Registration No. 2621/57

দাম ঃ ৮ টাকা মাত্র

বা ড় ছে . . . বা ড় ছে . . . বা ড় ছে . . .

আর সাথে-সাথে ওকে দেয়া আপনার উপহারও বেড়েই চলেছে !

আপনার শিশুকে দিন এমন উপহার , যা ওর বয়সের সাথে বাড়তেই থাকবে । বিনিয়োগ করুন ইউনিট ট্রাস্টের শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধিতে । আপনার শিশুর বয়স যখন 21 বছর হবে , তখন আপনার বিনিয়োগকৃত ঐ টাকা কয়েকগুণ বেড়ে, ওকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে । 18 বছর বয়স হ'লে ও প্রয়োজনে টাকা তোলার সুবিধেও পাবে। ইউনিট ট্রাস্টের শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি । সামান্য একটু পরিকল্পনা, আপনার শিশুর সুখ - সমৃদ্ধির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে পারে । **শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধির সুযোগে টাকা বাড়ছে তো বাড়ছে.. বেড়েই চলেছে** ~ ডিভিডেণ্ড ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে । চল্‌তি বছরের প্রদেয় ডিভিডেণ্ড 14% ~ বোনাস এখন দেয়া হচ্ছে প্রতি 3 বছরে ~ বোনাসের অংক ইউনিটে পুনর্বিনিয়োগ মারফৎ লাভের অংক আরো বেড়ে যাবে । আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে ইউনিট ট্রাস্টের শাখাসমূহে , যেকোনো তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে এবং জেলা- ভিত্তিক জমা কেন্দ্রগুলিতে । আবেদনপত্র– তথা- পুস্তিকার জন্যে যেকোনো ইউনিট ট্রাস্ট শাখা, প্রধান প্রতিনিধি বা এজেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

27 মিলিয়ন ইউনিট হোল্ডারের সেবায়

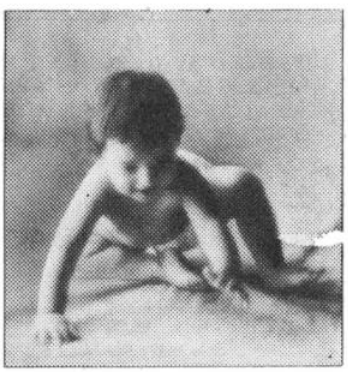

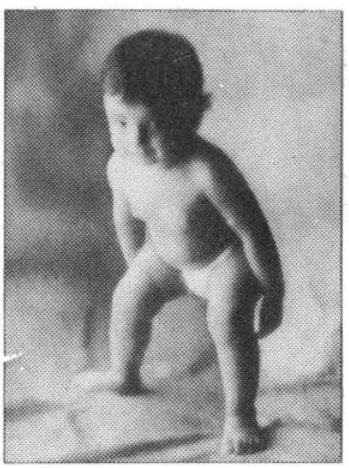

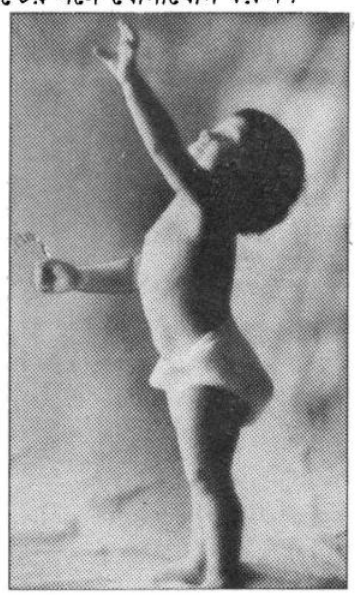

ইউনিট ট্রাস্টের শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধিতে বিনিয়োগ করুন !

সবই সিকিওরিটি বিনিয়োগে বাজারগত ঝুঁকি বয়েছে বিনিয়োগেব পূর্বে আপনাব বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা অথবা এজেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন ।

Sista's-UTI-474/92 BEN

শুকতারা

৪৬শ বর্ষ ● ৪র্থ সংখ্যা ● জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/মে ১৯৯৩

পেটকাটা ডাক্তার

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়ো বোন শিং হয়
পেট কাটা ডাক্তার
ছোটো বোন পিং হয়
ছুরি হাতে সিস্টার।
মুখেতে রুমাল বেঁধে
হাত পাতে শিং যেই
পিং চটপট করে
বাড়ায় ছুরিটা সেই।

শিং সেটা তুলে নিয়ে
বলে—পেট কাটবো।
আমি ভাবি এক্ষুণি
ছুটবো না হাঁটবো?
শিং বুঝে ফেলে বলে—
পিং, ওর হাত বাঁধ,
হোক ছোটো হাত তোর,
ধরে রাখ ওর কাঁধ!
রোজ আমি রুগী হই
পাই না যে নিস্তার
পেট কেটে জুড়ে দেয়
ডাক্তার সিস্টার।
খেলনার ছুরি হোক
খেলনার ছুঁচ হোক,
তবু আমি কাঠ হয়ে
শুয়ে থাকি বুঁজে চোখ!

এমন দিন কি আমি
পাবো নাকো কোনোদিন
আমি হবো ডাক্তার,
রুগী হবে শিং-পিং?

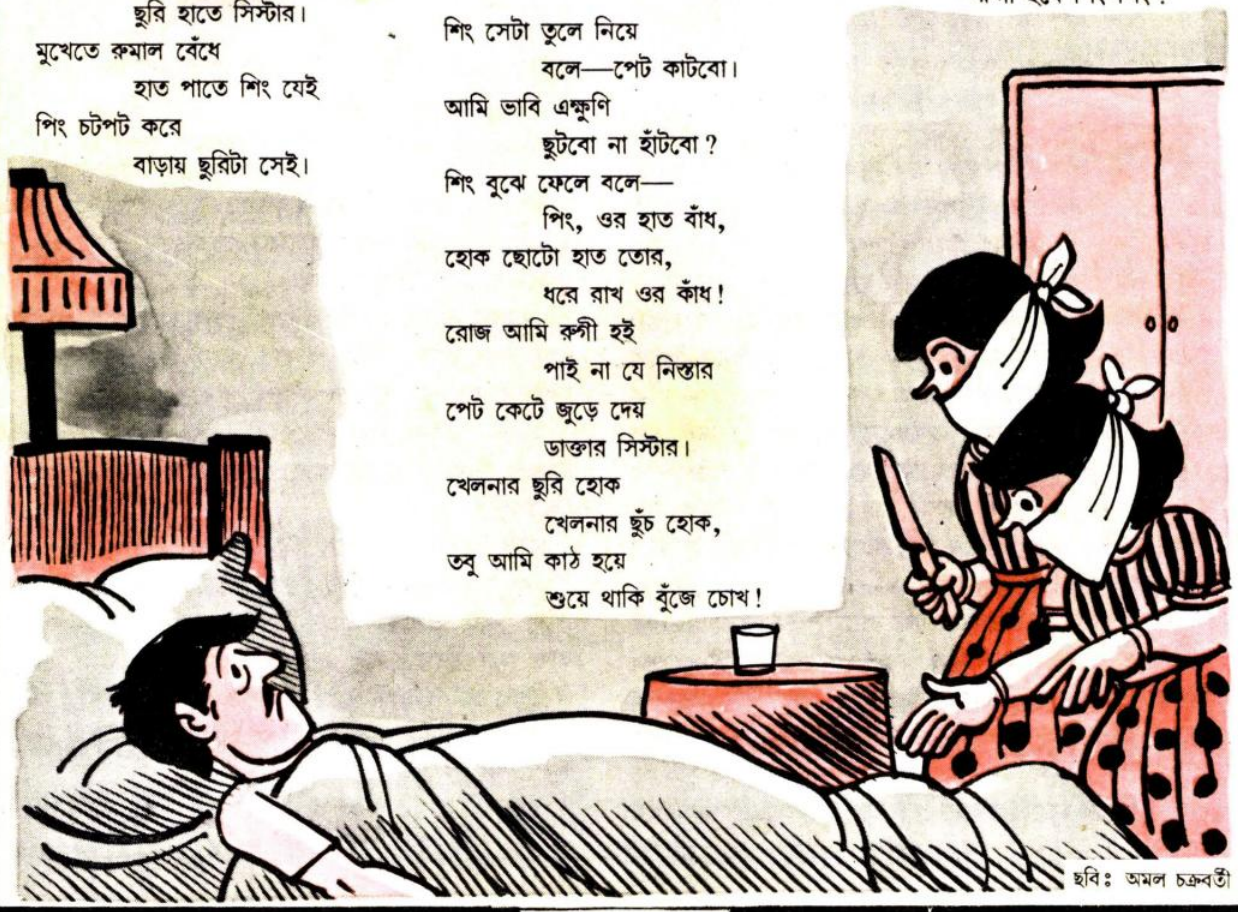

ছবিঃ অমল চক্রবর্তী

জঙ্গল রহস্য

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

(চার)

কমলদা এসে ডেকের ওপর দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ভোজবাজির মতো একটা লোক সামনে উদয় হলো। তার হাতে উদ্যত পিস্তল। চকিতে ব্যাপারটা যে কি ঘটে গেলো ওরা বোঝার আগেই লোকটা আদেশের সুরে বলে উঠলো, হাত তুলে দাঁড়াও। চিৎকার করলেই গুলি চালাবো।

লোকটার নজর কমলদার ওপর। বাবু লোকটার সব থেকে কাছে। বাবু তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। লঞ্চটা পুরো স্পিডে চলছে। ভটভট আওয়াজ আর জলের শব্দ কানে আসছে। লোকটার চোখে চোখ রেখে কমলদা আস্তে আস্তে হাত তুলছেন। বাবু দেখলো, কমলদাকে অসহায়ের মতো হাত তুলতে দেখে লোকটার মুখে ফুটে উঠেছে ব্যঙ্গের হাসি। বাবু আর দেরি করলো না। হঠাৎ লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আচমকা তার পেটে সজোরে ঘুঁষি মারলো।

'অঁক' করে শব্দ করে লোকটা পড়ে যেতে যেতে ডেকের রেলিং ধরে সামলে নিলো। কিন্তু পিস্তলটা ছিটকে পড়েছে ওপাশে। মিউ ছুটে গিয়ে তুলে নিলো সেটা। রাজা ডাইভ দিয়ে লোকটার কাছে গিয়ে তার দু পা জড়িয়ে ধরলো এমনভাবে যে তার আর নড়ার উপায় রইলো না। বাবু আরো গোটা দুই ঘুঁষি চালাতে চালাতে শুনতে পেলো কমলদা পিপ্ পিপ্ পিপ্ করে বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছেন। নিচে থেকে ধুপধাপ শব্দ করে চারজন প্লেন ড্রেসের পুলিশ এসে অবস্থা দেখে প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেলো। তারপর ছুটে গিয়ে লোকটাকে চেপে ধরলো। একজন দড়ি এনে লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো।

কমলদা প্রশংসার দৃষ্টিতে বাবু, রাজা আর মিউ-এর দিকে তাকালেন। তারপর মিউ-এর হাত থেকে পিস্তলটা নিতে নিতে বললেন, তোমরা কেউ লোকটাকে চেনো?

চারজন পুলিশই মাথা নাড়লো। ওদের চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল চেনা তো দূরের কথা ওদের কাউকে ওরা কোনোদিন দেখেওনি।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে বাবু ছুটে গিয়ে রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়লো। ও দেখলো, সেই স্পিড বোডটা প্রচণ্ড গতিতে ওদের দিকে ফিরে আসছে। ঐ বোট থেকেই ওদের দিকে রাইফেল তাক করা ছিলো। বাবু জলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, ঐ স্পিড বোটটা একটু আগে আমাদের লঞ্চের পাশ দিয়ে গেছে। স্পিড বোট থেকে আমাদের দিকে রাইফেল তাক করা ছিলো, আমি স্পষ্ট দেখেছি।

বাবুর কথা শুনে কমলদা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পুলিশদের বললেন, লোকটাকে তক্ষুণি নিচে নিয়ে যেতে। ওদের বললেন

যে যার কেবিনে চলে যেতে। নিজেও ওদের পেছনে পেছন যেতে যেতে বললেন, আমি স্পিড বোটটাকে ওয়াচ করতে চাই। তোরা কেউ জানলার পর্দা সরাবি না। আমার মনে হচ্ছে স্পিড বোটটার ফিরে আসার সঙ্গে একটু আগের ঘটনার একটা সম্পর্ক আছে।

কমলদার পেছন পেছন বাবু গিয়ে ওঁর কেবিনে ঢুকলো। কমলদা বাইনোকুলার হাতে নিয়ে জানলার ধারে গিয়ে বসলেন। জানলার পর্দা এমনভাবে একটুখানি সরালেন যাতে বাইরে থেকে কিছু বোঝা না যায়। বাবু এসে কমলদার পাশে দাঁড়ালো। ডেকে ঐ ঘটনাটা ঘটে যাবার পর থেকে বাবু উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে। লোকটাকে যখন বাঁধা হচ্ছিল তখন তার চোখের দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর ক্রোধ বাবু লক্ষ্য করেছিল। এমনভাবে বাবুর দিকে চেয়েছিল যেন কাছে পেলে ওকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। কমলদাকে নড়েচড়ে বসতে দেখে বাবু বুঝতে পারলো, স্পিড বোটটা কাছে এসে গেছে। বাবু এগিয়ে গিয়ে কমলদার পাশ দিয়ে জানলায় চোখ রাখলো।

বাবু দেখলো প্রচণ্ড গতিতে জলের ওপর দিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে স্পিড বোটটা ওদের লঞ্চের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

চোখ থেকে বাইনোকুলারটা নামাতে নামাতে কমলদা বললেন, ব্যাপারটা তো সুবিধের ঠেকছে না!

বাবু কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগে হন্তদন্ত হয়ে রাজা এসে কেবিনে ঢুকলো। ফিসফিস করে বলে উঠলো, স্পিড বোটটা যখন আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তখন ঐ চারজন পুলিশের একজনকে আমি একটা সবুজ রুমাল নাড়তে দেখলাম।

সবুজ রুমাল! তার মানে....তার মানে....সব ঠিক আছে....

কমলদা নিজের মনে কথাটা বলে উঠলেন। বাবু রাজাকে জিজ্ঞেস করলো, তুই নিচে যাচ্ছিলি কেন? তোর না কেবিনের মধ্যে থাকার কথা।

হ্যাঁ! কিচেনে চায়ের কথা বলতে যাচ্ছিলাম।

কমলদা গম্ভীর মুখে কিছু ভাবছিলেন। ওরা জানে এই সময় ওঁকে ডিসটার্ব করা চলবে না। ওরা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। তখনই মনে হলো কেউ একজন চকিতে সরে বাবু-রাজার কেবিনে ঢুকে পড়লো। বাবু আর রাজা ছুটে এসে কেবিনে ঢুকতেই লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপর। লোকটার ধাক্কায় রাজা পড়ে গিয়েছিল। বাবু লাফিয়ে পড়ে দুম-দাম করে ঘুঁষি মারতে লাগলো লোকটাকে।

রাজাকে ছেড়ে বাবুর দিকে ফিরতেই রাজা হাঁটু দিয়ে সজোরে লোকটার পেটে আঘাত করলো। সেই মুহূর্তে বাবুর ঘুঁষি এসে পড়লো লোকটার মুখে। অতো মার খাওয়া সত্ত্বেও লোকটা তেড়ে গেলো বাবুর দিকে। তখন রাজা ঝাঁপিয়ে পড়ে দু' হাত দিয়ে তার পা দুটো চেপে ধরতেই লোকটা মুখ থুবড়ে পড়লো কেবিনের মেঝেতে। বাবু লোকটার পিঠের ওপর বসে তার হাত দুটো চেপে ধরলো। বাবু ক্যারাটে শেখে। ও জানে পেছনে দু হাত এইভাবে চেপে ধরে রাখলে কেউ নড়তে পারে না। বাবু রাজাকে বললো, দড়ি দিয়ে শীগগির বেঁধে ফেল।

ওদের কাছে দড়িটড়ি সব সময় রেডি থাকে। রাজা প্রথমে শক্ত করে লোকটার দুটো পা আর বাবুর চেপে ধরে থাকা হাতটা বেঁধে ফেললো। বাবু উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে লোকটার মুখে গুঁজে দিলো। লোকটা মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বেশি নড়াচড়া করার ক্ষমতা ওর আর নেই।

রাজা বললো, সেই চারটে পুলিশের একটা না?

তাই তো মনে হচ্ছে। যা, কমলদাকে ডেকে নিয়ে আয়।

রাজা বেরিয়ে গেলো। প্রায় পরমুহূর্তেই কমলদাকে নিয়ে ফিরে এলো। কমলদা এসে লোকটার দিকে একমুহূর্ত তাকিয়েই বললেন, যা ভেবেছিলাম তাই। তার মানে আরো তিনটেও আছে।

কমলদার কথার অর্থ বুঝতে বাবু-রাজার একটুও অসুবিধা হলো না।

কমলদা বললেন, লোকটা এইভাবে থাক। তোরা বাইরে আয়। বাইরে থেকে দরজাটা লক করে দিবি।

কমলদা নিজের ঘরে চলে গেলেন। বাবু আর রাজা চলে গেলো ডেকে। ডেকে গিয়ে দাঁড়াতেই ওরা চমকে উঠলো। অনেক দূরে স্পিড বোটটা দেখতে পেলো। স্পিড বোটটা আবার ফিরে এসেছিল। ওরা যখন লোকটার সঙ্গে মারামারি করছিলো তখন পাশ দিয়ে চলে গেছে। ওরা বুঝতেই পারেনি! হঠাৎ রাজা চাপাগলায় বলে উঠলো, বাবু সাবধান....

বাবু চমকে তাকাতেই দেখলো একটা লোক ওদের দিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। ওরা ছিল রেলিংয়ের কাছে। পিছিয়ে যাবার উপায় নেই। লোকটা ঘুঁষি পাকিয়ে আসছে। যে কোনো মুহূর্তে আঘাত হানবে। বাবু আর রাজা একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল লোকটার দিকে। ভেবে পাচ্ছিলো না কি করবে।

হঠাৎ কিকি এসে লোকটার মুখে প্রচণ্ড জোরে ঝাপটা মারলো। সেই সঙ্গে ঠুকরে দিলো।

উঃ, বলে লোকটা দু হাত দিয়ে মুখটা ঢাকতেই মিউ পেছন থেকে একটা লাঠি দিয়ে মারলো ওর পায়ে। লোকটাকে বেসামাল দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবু আর রাজা। বেশিক্ষণ লাগলো না তাকে কাবু করতে। মোমা ততক্ষণে ছুটে গিয়ে দড়ি এনেছে। লোকটাকে বেঁধে ওরা একটা ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিলো। বাবু বললো, এবার নিচে চল অন্য লোক দুটোর ব্যবস্থা করবো।

ব্যাপারটা কি হচ্ছে রে বাবুদাদা? মিউ জিজ্ঞেস করে।

আমার মনে হয় ঐ চারজনের কেউ পুলিশ নয়। ওরা

ঠিক তখন অন্য লোকটা ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো।

ছেলেধরাদের গ্রুপের লোক।

মোমা বললো, কমলদাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হতো না?

না, কমলদা আমাদের ছাড়বে না। চারজনে মিলে ওদের দুজনকে ঠিক কব্জা করে ফেলবো। কিকিও তো আছে।

নিজের নাম শুনে কিকি বলে উঠলো, চলো চলো!

এই সব অ্যাকশানে কিকি খুব মজা পায়। লড়তেও পারে!*

বাবু বললো, আমরা যেন চা-টা কিছু খাবার জন্যে কিচেনের দিকে যাচ্ছি, ওরা যেন সন্দেহ করতে না পারে। মিউ কিকিকে বুঝিয়ে দেয় ও যেন গিয়ে আড়ালে থাকে । দরকার পড়লেই লোকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ওরা নিচের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই কিকি উড়ে গেলো।

একটা লোক উল্টো দিকে মুখ করে বসে বিড়ি টানছিল। লঞ্চের একটা কাঠের পোস্টে হেলান দিয়ে বসেছিলো লোকটা। বাবু পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলো। ওর হাতে একটা নাইলনের দড়ি। লোকটা গুনগুন করে গান গাইছে আর ফুক ফুক করে বিড়ি টানছে। বাবু যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতেও পারেনি। রাজাও এগিয়ে গিয়েছিল। সে বাবুর ক'পা পেছনে। তার হাতে একটা রুমাল।

বাবু আচমকা দড়িটা লোকটাকে বেড় দিয়ে এনেই ওকে শক্ত করে বাঁধতে লাগলো। ব্যাপারটা কি হচ্ছে বোঝার আগেই রাজা ছুটে গিয়ে লোকটার মুখে রুমালটা গুঁজে দিলো। বাবু যখন লোকটাকে প্রায় বেঁধে ফেলেছে, ঠিক তখন অন্য লোকটা ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। সাথীর অবস্থা দেখে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবুর ওপর। বাবুকে তুলে ধরে ঘুঁষি মারতে গিয়েই উঃ বলে ককিয়ে উঠলো লোকটা। আড়াল থেকে হঠাৎ উড়ে এসে কিকি নখ দিয়ে ওর মুখটা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। বাবু আর রাজা সেই ফাঁকে ঢুসুম-ঢুসুম করে লোকটাকে কিল-ঘুঁষি মারতে শুরু করে দিয়েছে। অন্য লোকটাকে মিউ ততক্ষণে পোস্টটার সঙ্গে আচ্ছা করে বেঁধে ফেলেছে।

অন্য লোকটা রীতিমতো ষণ্ডা গোছের। সে একা লড়তে লাগলো চারটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে। বাবু-রাজাকে দু চারটে ঘুঁষি হজম করতে হচ্ছে। মোমা যে কোন ফাঁকে ওপরে উঠে গিয়েছিল কেউ টের পায়নি। সে তাড়াতাড়ি কমলদাকে ডেকে এনেছে। কমলদা পিস্তল হাতে নিয়ে সামনে দাঁড়াতেই লোকটার হম্বিতম্বি থেমে গেলো। কমলদার নির্দেশে ওরা লোকটাকে বেঁধে ফেললো আর একটা পোস্টের সঙ্গে। লোকটা যথেষ্ট আঘাত পেয়েছিল। কিকির নখের আঁচড়ে তার মুখটা রক্তারক্তি হয়ে গেছে।

কমলদা চটপট ছাদে উঠে গিয়ে সারেংকে বললেন লঞ্চ ঘুরিয়ে হাসনাবাদে যেতে। তারপর ছুটে গিয়ে ওয়ারলেসে খবর পাঠাতে লাগলেন,

হ্যালো...হ্যালো...রজার...দিস ইজ চার্লি...হ্যালো... হ্যালো...উই আর ইন ডেঞ্জার...গোয়িং ব্যাক...অ্যারেঞ্জ ফোর্স ইমিডিয়েটলি...ওভার...

ওয়ারলেসে খবর পাঠানোর পর কমলদা ওদের সঙ্গে গিয়ে

* কেল্লা রহস্য, ভাঙাবাড়ির রহস্য দ্রষ্টব্য।

এক এক করে চারটে লোককে দেখলেন। ওদের বাহাদুরির জন্যে পিঠ চাপড়ে দিয়ে নিজের মনে বললেন, আমার সন্দেহই তাহলে ঠিক!

কি সন্দেহ করেছিলে তুমি?

এরা পুলিশ নয়। পুলিশের ছদ্মবেশে লঞ্চে উঠেছে।

কখন সন্দেহ করেছিলে?

বাঁশি বাজিয়ে যখন ওদের ডেকেছিলাম তখন ওদের আসা আর লোকটার দুরবস্থায় ওদের মুখ চোখের অবস্থা দেখে। লোকটা যে ওদের অচেনা নয় তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। তার উপর রাজা তো এসে বলেই দিলো সে ওদের একজনকে সবুজ রুমাল নেড়ে স্পিড বোটটাকে ইশারা করতে দেখেছে।

তার মানে প্রথমে যে লোকটা তোমার দিকে পিস্তল বাগিয়ে ধরেছিল সে ওদেরই একজন?

তাই তো! পুরো ব্যাপারটা যে গট আপ এখন বুঝতে পারছিস তো? গ্রিন সিগনাল পেয়ে স্পিড বোটটা নিজের ডেরায় ফিরে গেছে। আমাদেরও যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এই পথ ধরে বাগনানের দিকে ফিরে যেতে হবে। সময়ের গোলমাল দেখে ওরা হয়তো কিছু আঁচ করতে পারবে। সাবধানও হয়ে যাবে। কিন্তু কিছু তো আর এখন করার নেই।

লঞ্চটা যখন হাসনাবাদের ঘাটে পৌঁছুলো তখন সেখানে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। সকালবেলাতেই কলকাতা থেকে ক'জন অফিসার আর পুলিশ এসে গেছেন। কমলদার নির্দেশ মতো লোক পাঁচটাকে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা হলো। কমলদার চেনা চারজন উঠে এলেন লঞ্চে।

লঞ্চ ছেড়ে দিলো। হাসনাবাদের কাটা খাল দিয়ে দুলকি চালে লঞ্চ এগিয়ে চললো ইছামতীর দিকে। বাবু ঘড়ি দেখে বললো, মাত্র দু'ঘন্টার মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেলো!

মারামারির সময় রাজার একটু লেগেছিল। লাগা জায়গায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো, শুরুটা মন্দ হলো না—কি বল!

ওদের মধ্যে মোমা একটু ভীতু। ঐ সব মারামারি-টারি দেখে একটু ঘাবড়িয়ে গেছে। বললো, সুন্দরবনে না গেলেই কি চলতো না। কদিন না হয় টাকীতেই থাকতাম। নৌকোয়-টৌকোয় চড়তাম।

মোমার কথা শুনে ওরা হেসে উঠলো। একটু পরেই কমলদা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, খানিক বাদেই আমরা রায়মঙ্গল আর কালিন্দীর সংগমস্থলটা পার হবো। দূরে একটু কুয়াশা কুয়াশা ভাব দেখতে পাচ্ছিস তো?

ওরা মাথা নাড়লো। তাকিয়ে থাকলো সেই দিকে। ডান দিকে ডাঙা রেখে ওরা যাচ্ছিলো। হঠাৎ দেখলো ডাঙা আর নেই। তার বদলে শুধু জল আর জল। যতদূর চোখ যায় বড় বড় ঢেউগুলো লঞ্চের গায় এসে আঘাত করছে। ডান দিক, বাঁ দিক, সামনে কোনোদিকেই ডাঙা দেখতে পাচ্ছে না। পেছন দিকে তাকালে স্থলভাগের রেখা, গাছ-গাছালির অস্পষ্ট আভাস চোখে পড়ে। একটু পরে তাও দেখা যাবে না। কমলদা বললেন, এই হচ্ছে দুটো নদীর মিলনস্থল। ডানদিক থেকে কালিন্দী এসে রায়মঙ্গলের সঙ্গে মিলেছে। ঢেউগুলো দেখেছিস কত বড় বড়। শীতের দুপুরের মিষ্টি রোদ ঢেউগুলোর মাথার ওপর যেন নাচছে। এই জায়গাটায় হাওয়ার জোরও কত বেশি দেখেছিস।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ওরা অবাক চোখে দেখছিল। বাবু আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, লোকগুলো কি ছেলেধরার দলের?

তাই তো মনে হচ্ছে!

ওরা লঞ্চে উঠলো কি করে? যে পুলিশদের আমাদের সঙ্গে যাবার কথা ছিল তাদের কি হলো?

কমলদা একটু চুপ করে থেকে বললেন, সেইটাই তো ওদের দেখতে বললাম। এতক্ষণে নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া গেছে। ওদের কাছ থেকে সব কিছু জানা যাবে।

বাঃ বাঃ, এরা তো দেখছি সাংঘাতিক। পুলিশের সঙ্গে লড়তে ভয় পায় না।

সে তো কাল রাত্তিরেই দেখেছিস। ওসির কাছ থেকে কিভাবে নিজেদের লোকটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো।

সেই বিশাল জলধারা পার হয়ে লঞ্চটা ততক্ষণে আরো এগিয়ে গেছে। নদীর বিস্তার কমে যাচ্ছে। কমলদা বললেন, আমরা এবার বনের মধ্যে ঢুকছি। লক্ষ্য করেছিস নদীটা আর আগের মতো মস্ত বড় নেই। ছোট খালের মতো হয়ে গেছে।

মোমা বললো, বাঘ দেখতে পাবো?

অসম্ভব নয়। আমরা বাগনানে নামবো। বাগনানের পর মানুষের মুখ আর দেখা যায় না। এখানে ফরেস্টের শেষ অফিস। ফরেস্টারকে জানানো আছে। দুপুরের লাঞ্চটা আমরা এখানেই সারবো!

দুপুর? বিকেল বলো!

তা যা বলেছিস। কমলদা হাসলেন।

বাগনানের ঘাটে লঞ্চটা এসে দাঁড়াতেই ওরা ভীষণভাবে চমকে উঠলো। সাত আট জন লোক হঠাৎ ছুটে এসে বন্দুক তাক করে দাঁড়ালো।

এমনটা তো হবার কথা নয়। ওরা কি তাহলে আবার সেই দুষ্টু লোকগুলোর পাল্লায় পড়লো?

[চলবে]

ছবি: বিজন কর্মকার

কাজের মেয়ে

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

অবিনাশবাবু নতুন বাড়ি করে এ পাড়ায় উঠে আসার পর থেকেই ঝঞ্ঝাট যেন সংসারে লেগেই আছে। বলা নেই কওয়া নেই যখন তখন লোডশেডিংয়ের দাপট, এরই সঙ্গে আবার সবচেয়ে বড় ঝামেলা কাজের লোক পাওয়া যায় না। অবিনাশবাবুর স্ত্রী তাই প্রায়ই বলেন আগের পাড়া ঢের ভাল ছিল, চাইলেই ঝি চাকর পাওয়া যেত। আর হাসপাতাল কাছে থাকায় লোডশেডিং বলে কিছু একেবারেই ভোগ করতে হয়নি।

অবিনাশবাবু ব্যবসাদার মানুষ, লোকজন খাটানোর অভিজ্ঞতা আছে। উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষ তিনি। ব্যবসাটা বেশ ভালই চলে। অনেকদিন আগেই এ পাড়ায় এই জমিটা কেনা ছিল, শেষ পর্যন্ত তাই বাড়ি তৈরি করে এ পাড়ায় চলে এসেছেন। ছেলেমেয়েরাও খুশি। স্কুল, কলেজও কাছে।

পাড়াটা সব দিক দিয়ে ভালই। পড়শীরাও খারাপ নয়। সকলের সঙ্গে বেশ আলাপও হয়ে গেছে অবিনাশবাবুর তো বটেই, বাড়ির সকলেরও। কিন্তু কাজের লোক নিয়ে এমন বিপদে পড়তে হবে কেউই ভাবেননি।

রবিবারের এক সকালে অবিনাশবাবু বাইরের ঘরে বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজের পাতা উল্টে চলেছিলেন। অবশ্য খবরের দিকে তাঁর নজর ছিল না। বলতে কি খবর পড়তে তাঁর ভাল লাগে না। কাগজের পাতায় নজর দিলেই চোখে পড়ে খুন আর সন্ত্রাসের খবর। মানুষ সম্পর্কে যেন আর শ্রদ্ধা রাখা যায় না। তাই কাগজের পাতায় অবিনাশবাবু পড়েন শুধু বিজ্ঞাপন। অনেক সময় কাজের লোকের বিজ্ঞাপনও পাওয়া যায় খবরের কাগজের পাতায়। অবিনাশবাবু তো নিজেই একটা এরকম বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় কিনা ভাবতে শুরু করেছিলেন।

ঘরের রাস্তামুখো দরজাটা খোলাই ছিল। হঠাৎ একটা মেয়েলী কণ্ঠস্বর শুনে অবিনাশবাবু ঘুরে তাকালেন।

'বাবু।'

'কে?' বলে তাকাতেই অবিনাশবাবু দেখতে পেলেন বছর পনেরোর শ্যামবর্ণা একটি মেয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

মেয়েটি আরও একটু সামনে এগিয়ে এল।

'কে তুমি? কি চাই?' অবিনাশবাবু প্রশ্ন করলেন।

'বাবু, শুনলাম আপনারা কাজের লোক খুঁজছেন তাই—' আস্তে আস্তে বলল মেয়েটি।

এ যে মেঘ না চাইতেই জল! উৎফুল্ল হয়েও একটু থমকেও গেলেন অবিনাশবাবু। এখনকার দিনকাল ভাল নয়। কি মতলব মেয়েটার কে জানে?

মনোভাব গোপন রেখেই তিনি বললেন, 'তুমি কোথায় শুনলে যে কাজের লোক চাই আমরা? কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'এই পাড়াতেই একজনের বাড়িতে শুনেছি বাবু, তাই ভাবলাম যদি আমাকে রাখেন।' মেয়েটি সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল।

'হুঁ। কোথায় কাজ করেছ এর আগে? সে কাজ ছাড়লে কেন?'

'কলকাতায় বেশিদিন আসিনি, বাবু। এখানে তো তাই কাজ করিনি। দেশে অন্য কাজ করতাম', মেয়েটি জানাল।

'দেশ কোথায় তোমার?' অবিনাশবাবুর মনে তবুও সন্দেহ।

'দক্ষিণ বারাসতে।'

ততক্ষণে অবিনাশবাবুর স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছিলেন। অবিনাশবাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কাজের লোকদের সঙ্গে এই ধরনের কথা বলা তাঁর অভ্যাস নেই। তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'নাও।

তোমার কাজের লোক আপনা থেকেই এসে পড়েছে, ভাল করে বাজিয়ে নাও।'

অবিনাশবাবুর স্ত্রীই এবার মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। কথায় কথায় মেয়েটি জানাল তার নাম পারুল। বাড়ি দক্ষিণ বারাসতে। বাবা, মা, ভাই বোনও আছে। তারা চাষবাস করে, কিন্তু সংসার চলে না তাই সে কাজ করতে কলকাতায় এসেছে।

মেয়েটির কথাবার্তা সপ্রতিভ। অবিনাশববুর স্ত্রীর ভালই লাগল। রাখা যাক না ক'দিন। তেমন তেমন বুঝলে না হয় ছাড়িয়ে দেওয়া যাবে। এখন যা অবস্থা যা হোক কোনো লোক জুটেছে তাই যথেষ্ট।

অবিনাশবাবুকে কথাটা বলতে তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'দিনকাল ভাল নয়, অজাত কুজাত কি ঘরের মেয়ে কে জানে। তবে বলছ যখন কদিন না হয় রেখেই দেখ।'

অবিনাশবাবু এবার পারুলকে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে রাখছি। তা, কত মাইনে নেবে?'

পারুল খুশি হয়ে বলল, 'যা হয় দেবেন বাবু।'

মাথা নাড়লেন অবিনাশবাবু, 'তাই কি হয়, ঠিক করে বল কত দিতে হবে।'

'ষাট টাকা দেবেন বাবু,' পারুল বলল।

'বেশ, ষাট টাকাই দেব। কাজকর্ম সব রকম করতে পারবে তো?'

'হ্যাঁ, পারব। আমি সব কাজই জানি, বাবু,' পারুল হেসে বলল। 'তাহলে আমার সব জিনিস নিয়ে আসি?'

'কোথায় আছে তোমার জিনিস?' অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার গ্রামের একজনের কাছে। এখনই নিয়ে আসছি, বাবু। এই যাব আর আসব।'

পারুল চলে যেতেই অবিনাশবাবু স্ত্রীকে বললেন, 'রেখে তো দিলাম মেয়েটাকে। চোখে চোখে রেখ, দিনকাল সুবিধের নয়।'

'তোমার সবাইকেই অবিশ্বাস, ব্যবসাদার কিনা,' অবিনাশবাবুর স্ত্রী বললেন।

অবিনাশবাবু কেবল জবাবে বললেন, 'হুঁ।'

ওই দিন থেকেই বহাল হয়ে গেল পারুল। জিনিসপত্র নিয়ে সে হাজির হওয়ার পর থেকে। জিনিসপত্র বলতে অবশ্য একটা ছোট টিনের স্যুটকেস আর গোটা দুই জামা আর শাড়ি।

পারুল কাজকর্ম বেশ ভালই করে চলল এরপর। অবিনাশবাবুর সমস্যাও দূর হলো। ছেলেমেয়েদের ভাল লাগল পারুলকে। স্বভাবটা ওর বেশ মিষ্টিই। অবিনাশবাবুর মেয়ে স্বাতীর মুখে তো খালি পারুল আর পারুল।

মনে মনে খুশি অবিনাশবাবু। মস্ত একটা সমস্যার সমাধান হয়েছে এতদিনে।

ভালই কাটছিল বাড়ির সকলের দিনগুলো। ব্যবসাও বেশ ভালই চলছিল অবিনাশবাবুর। ইতিমধ্যে মেয়ে স্বাতীর বিয়ের কথাবার্তাও পাকা।

পারুল কাজে বহাল হওয়ার পর প্রায় একমাস কেটে গেছে। বাড়িতে লোকজনের যাতায়াত বেড়েছে। আত্মীয়স্বজনরা আনাগোনা করছেন। তবে পারুল যেন একাই একশ, সবই সে সামলাচ্ছে।

অবিনাশবাবুর স্ত্রীও পারুল বলতে অজ্ঞান। তাকে উপহারও দেন মাঝে মাঝে। দুখানা ভাল শাড়ি আর একখানা গায়ের চাদরও কিনে দিয়েছেন।

অবিনাশবাবু একদিন বললেন, 'বেশি লোভ বাড়িয়ে দিও না। এই সব কাজের মেয়েদের তো কৃতজ্ঞতা বোধ থাকে না।'

'পারুল বোধ হয় তেমন নয়,' অবিনাশবাবুর স্ত্রী বললেন, 'আহা, মেয়েটার শীতে গায়ে দেবার কিছু ছিল না।'

মেয়ের বিয়ের আর মাত্র দিন তিনেক বাকি। বাড়িতে প্যান্ডেল বাঁধা শুরু হয়েছে। বাড়ির সবাই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিয়ের সমস্ত আসবাব ও জিনিসপত্রও পৌঁছে যেতে শুরু করেছে। অবিনাশবাবু উচ্চ মধ্যবিত্ত ব্যবসাদার মানুষ। একমাত্র মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে খরচও ভাল মতোই করবেন ঠিক করেছিলেন। তাই সেদিন ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকা তুলে এনে রেখেছিলেন বাড়িতে।

আগামীকাল বিয়ে। স্বভাবতই বাড়িতে উৎসবের আমেজ। বাড়ি গমগম করছে আত্মীয়-পরিজনের আনাগোনায়। বিকেলবেলা অবিনাশবাবু হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ লক্ষ্য করলেন পারুল ঘন ঘন চোখ মুছছে। মেয়েটা কোনো কারণে কাঁদছে বুঝলেন তিনি। নিজে কিছু না বলে স্ত্রীকে ডাকলেন। স্ত্রী আসতেই অবিনাশবাবু বললেন, 'পারুলকে কিছু বলেছ নাকি? ওকে কাঁদতে দেখলাম যেন।'

'কই, না!'

'একবার ডাক তো ওকে,' অবিনাশবাবু বললেন।

'পারুল,' বলে ডাকতেই সে এসে দাঁড়াল অবিনাশবাবুর স্ত্রীর কাছে।

'কি হয়েছে রে, পারুল, কাঁদছিলি কেন?' অবিনাশবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করতেই পারুল প্রায় অবিনাশবাবুর পায়ে আছড়ে পড়ল।

'বাবু—আপনাদের ভয়ানক বিপদ!' চেঁচিয়ে কান্নাভেজা গলায় বলে উঠল পারুল।

হকচকিয়ে গেলেন অবিনাশবাবু। 'বিপদ? কিসের বিপদ?' তিনি বলে উঠলেন।

'বাবু—আজ রাত্তিরে আপনাদের বাড়িতে ডাকাতি হবে,' কান্নাঝরা গলায় কোনো রকমে উত্তর দিল পারুল।

'ওমা, কি সর্বনাশ!' বলে উঠলেন অবিনাশবাবুর স্ত্রী।

'কিন্তু—তুমি জানলে কি করে?' কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন অবিনাশবাবু।

পারুল এবার যা বলল তাতে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন স্বামী স্ত্রী দুজনেই। পারুল জানাল, সে কাজে লেগেছিল ডাকাতদের সাহায্য করবে বলে। ডাকাতদের মধ্যে আছে তার ভাই। সে একজন ভয়ঙ্কর অপরাধী। বহু খুন আর ডাকাতি করেছে সে এর আগে। খোঁজখবর নিয়ে মতলব হাঁসিল করার উদ্দেশ্যে পারুলকে কাজে লাগিয়েছে তার ভাই। আজই রাত্তিরে বারোটার পর সবাই ঘুমোলে তারা আচমকা হানা দেবে এই রকম কথা আছে। বাড়ির পিছনের দরজা খুলে রাখার কথা পারুলেরই।

পড়েছিল রক্তাক্ত একটা মৃতদেহ।

পারুল এভাবে সব কথা জানিয়ে দিল কেন এটাই বুঝে উঠতে পারলেন না অবিনাশবাবু। তিনি তাই প্রশ্ন করলেন, 'এসব কথা সত্যি, পারুল? ঠিক করে বল, না হলে এখনই পুলিশে দেব। ডাকাতি হবে একথা তুমি বলে দিলে কেন?'

'বাবু,' কাতর ভাবে কাঁদতে কাঁদতেই বলল পারুল, 'আপনারা আমাকে এত আদর করে আশ্রয় দিয়েছেন। এ অধর্ম আমি কিছুতেই করতে পারব না, বাবু। আমাকে আপনি পুলিশে ধরিয়ে দিন, আমি সব আবার স্বীকার করব।'

'ঠিক আছে, সে দেখা যাবে। বাড়ি ছেড়ে তুমি কোথাও যেতে পারবে না,' বলেই অবিনাশবাবু বাড়ির পুরুষ আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে ভয়ানক বিপদের কথাটা জানিয়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় আলোচনা করতে শুরু করলেন।

কথাটা জানাজানি হতেই সারা বাড়িতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। বাড়ির সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। সকলেই বললেন, এখুনি পুলিশকে খবর দিতে। সন্ধ্যে প্রায় সাতটা বেজেছে। পাঁচ ঘণ্টার মতো সময় হাতে আছে। তবে বলা তো যায় না ডাকাতরা যদি আগেই এসে পড়ে।

অবিনাশবাবুর পিসতুতো ভাই কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার। টেলিফোন তুলে অবিনাশবাবু দ্রুত তাঁকেই সব কথা জানিয়ে সাহায্য চাইলেন।

ডেপুটি কমিশনার প্রশান্ত লাহিড়ী সব শুনে অবিনাশবাবুকে অভয় দিয়ে বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই, তিনি এখুনি পুলিশ ফোর্স পাঠাচ্ছেন অবিনাশবাবুর বাড়ির ওপর নজর রাখতে। তিনি নিজেও থাকবেন তাদের সঙ্গে। তবে তিনি অবিনাশবাবুকে সাবধান করে দিলেন, পারুল যেন কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে যেতে না পারে বা অবিনাশবাবুরা এমন কিছু যেন না করেন যাতে ডাকাতদের সন্দেহ হয়।

টেলিফোন করে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন অবিনাশবাবু। তবুও একটা চাপা আশঙ্কায় গোটা বাড়িটা যেন নিঝুম হয়ে গেল। পারুল বোবা হয়ে ঘরের এক কোণে বসে রইল।

একটু একটু করে রাত বেড়ে চলেছে। বাড়ির কারো চোখে ঘুম নেই। ঘড়িতে রাত বারোটা বাজতেই তটস্থ হয়ে উঠল ছোটবড় সবাই। সকলেরই মনে একটা কি হয় কি হয় ভাব। পুলিশ কি সত্যিই পৌঁছেছে?

সকলেই বাড়ির দোতলায়। সিঁড়ির মাথায় বয়স্ক পুরুষরা যে যা পেয়েছেন অস্ত্র হাতে তৈরি। আচমকাই রাস্তায় শোনা গেল প্রচণ্ড বোমা ফাটার আওয়াজ, তারই সঙ্গে বন্দুকের শব্দ। অবিনাশবাবু জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখতে পেলেন সারা রাস্তা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আর ছুটোছুটি করছে দলে দলে সশস্ত্র পুলিশ। আবার গুলির শব্দ ওঠার পরেই নিচের দরজায় কেউ ধাক্কা মারল।

অবিনাশবাবু নিচে নামতে যেতেই তাঁর স্ত্রী পথ আটকে দাঁড়ালেন 'না, তুমি যেও না।'

নিচে খুব শোরগোল উঠেছে ততক্ষণে। আশেপাশের বাড়ির লোকজনও জেগে বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। নিচে এবার শোনা গেল ডেপুটি কমিশনার প্রশান্ত লাহিড়ীর গলা, 'অবিনাশদা, নেমে আসুন, আর ভয় নেই। ডাকাতরা ধরা পড়েছে।'

অবিনাশবাবু দ্রুত নিচে গিয়ে দরজা খুললেন। প্রশান্ত লাহিড়ী আর একজন পুলিশ অফিসার তাঁকে দেখে বললেন, 'তিনজন গুলিতে মারা গেছে। বাকি চারজন ধরা পড়েছে। একটা ডেঞ্জারাস গ্যাং—'

প্রশান্ত লাহিড়ীর কথা শেষ হওয়ার আগেই অবিনাশবাবুর পাশ কাটিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল পারুল। একটু দূরে রাস্তার উপরেই পড়েছিল রক্তাক্ত একটা মৃতদেহ। পারুল বুকফাটা আর্তনাদ করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'দাদা, দাদা—আমিই তোদের মেরে ফেললাম,' চিৎকার করে কেঁদে বলল পারুল।

অবিনাশবাবু আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন। বছর পঁচিশের স্বাস্থ্যবান এক যুবকের মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে কেঁদে চলেছিল পারুল। কয়েক জন পুলিশ এগিয়ে আসতেই অবিনাশবাবু হাত নেড়ে বারণ করলেন। ধীরে ধীরে তিনি পারুলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

'প্রশান্ত', অবিনাশবাবু ডেপুটি কমিশনারকে লক্ষ্য করে বললেন, 'একটা অনুরোধ করছি। পারুলকে এই কেসে জড়িও না। আজ ও নিজের ভাইয়ের জীবনের বিনিময়ে আমাদের বাঁচিয়েছে। আজ থেকে ও এই বাড়িরই মেয়ে। ওর সমস্ত দায়িত্ব আমার।'

আমবাগানে ঘোৎনা

অরুণ দে

ঘোৎনা ঘাবড়াবার ছেলে নয়, তবু হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে দেখে তার ভয়ভয় করতে লাগল। শীতের রাত্রি। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আশেপাশে ঝোপ-ঝাড়, গাছ-গাছালি।

অন্ধকারে বাগানের ভিতরের সরু পথ যদিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না তবু ঘোৎনা এগিয়ে যাচ্ছিল। সরু পথটা পেরিয়ে আমবাগানে পৌঁছনই তার ইচ্ছা।

আমবাগানের পাকা পাকা আম কয়েকদিন আগেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কোচিং ক্লাসের শিক্ষক ভূতনাথবাবুর আমবাগান। ঘোৎনা নিয়মিত কোচিং ক্লাসে পড়তে আসে। বই-এর থেকে আমের দিকেই তার মনোযোগ বেশি। কোচিং ক্লাসের ঘরের জানালা দিয়ে সে পাকা আমগুলির দিকে কতদিন লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে। একদিন ভূতনাথবাবুর কাছে আম চেয়েছিল, কিন্তু তিনি দিতে রাজী হননি। মাথায় গাঁট্টা মেরে বলেছিলেন, 'কোচিং ক্লাসে পড়তে এসেছ, আম খেতে নয়।'

তাঁর গাঁট্টায় মাথার কিছুটা আমের মতো ফুলে গিয়েছিল। সেই থেকে সে প্রতিজ্ঞা করেছে স্যারের বাগানের আম সে যে ভাবেই হোক লোপাট করবে। দিনের বেলায় সে কাজ সম্ভব নয় বলেই সে রাতের অন্ধকারে আম চুরি করতে এসেছে।

অন্ধকারের মধ্যে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ দেখে সে থমকে দাঁড়িয়েছে। ভূত-প্রেতে যদিও তার বিশ্বাস কম তবু কেমন যেন সন্দেহ জাগল মনে। অনেকে নাকি বাড়িতে চোর ঢোকার ভয়ে কুকুর পুষেছে, কিন্তু ভূতনাথবাবু আম রক্ষার্থে বাগানে ভূত পোষেন কিনা কে জানে! স্যারের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ভুতুড়ে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকার পর ঘোৎনার মনে হলো চোখ দুটো নড়ছে। পরক্ষণেই গাছের উপর কিসের যেন শব্দ হলো আর চোখ দুটো ক্রমশ তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ঘোৎনা থরথর করে কাঁপতে লাগল। ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। একটু পরেই তার মনে হলো পায়ে ভূত আঁচড় কাটছে। পা-টা সরিয়ে নেবার জন্য তুলতেই 'ম্যাঁও' ডাক শুনে তার ঘোর কাটল। চোখ খুলে মনে হলো একটা কালো বেড়াল তার পায়ের ওপর নখ নিয়ে আঁচড়াচ্ছে। ও হরি! অন্ধকারে এই বেড়ালের চোখ দুটোই এতক্ষণ জ্বলজ্বল করছিল। অন্ধকারে বেড়ালটাকে স্পষ্ট দেখতে না পেলেও বেড়ালটা আরও কয়েকবার 'মিউ-মিউ' করে ডাক ছাড়তেই ঘোৎনার সাহস ফিরে এল। সে বেড়ালটাকে একটা লাথি কষিয়ে বলল, 'আমি বাংলার বীর ঘোৎনা, দুনিয়ার কাউকে ভয় পাই না। আমাকে ভয় দেখান হচ্ছে? মেরে তক্তা বানিয়ে দেব।'

কালো বেড়ালটা কি বুঝল কে জানে। লাফাতে লাফাতে দ্রুতপায়ে অন্যদিকে ছুটে পালাল। ঘোৎনা বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে আমবাগানে ঢুকে পড়ল।

একটা আমগাছের সামনে এসে সে ওপর দিকে তাকাল। স্পষ্ট দেখতে না পারলেও সে বুঝতে পারল বড় বড় অসংখ্য পাকা আম গাছটায় ঝুলছে। হাওয়াতে মাঝে মাঝে দোল খাচ্ছে।

গাছের নিচের দিকে যতটা অন্ধকার, উপর দিকটা আকাশের দিকে প্রসারিত বলে ততটা ঘন অন্ধকার নয়। সে গাছে ওঠার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কোথা থেকে একটা কালো ছায়ামূর্তি গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে ঝুপ করে নিচে লাফিয়ে পড়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে নাকী সুরে বলল, 'কি খোঁকা, আঁম চুঁরি কঁরতে এঁসেছ? ঠেঁঙ্গিয়ে আঁমসত্ত্ব বাঁনিয়ে দেঁব। বুঁঝেছ?'

'আপনি কে?' কাঁপা গলায় বলল ঘোৎনা।

'আঁমি ভূঁত? এঁই গাঁছেই থাঁকি। পাঁলাও, নঁইলে ঘাঁড় মুঁটকে খাঁব।'

কালো ছায়ামূর্তি যদিও ভূতের মতো নাকী সুরে কথা বলছিল তবু ভূতের গলার স্বর ঘোৎনার কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো। সে সাহস সঞ্চয় করে কালো মূর্তিকে ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগল। সে শুনেছিল ভূতের পা নাকি পেছন দিকে ঘোরান থাকে। ভূতের পায়ের দিকে তাকাতেই এক জোড়া বুট জুতো তার চোখে পড়ল। পায়ের নিচের দিক বাদ দিয়ে বাকি দেহ, এবং মাথা কালো বোরখায় ঢাকা।

ঘোৎনা গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। ফের নাকী সুরে কথা বললে ঘুঁষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেব। সত্যি করে বল তুই কে?'

ভূত কোনো উত্তর দিল না। সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়াল। কয়েক পা এগোতেই ঘোৎনা খপ করে তার বোরখা টেনে ধরে বলল, 'পালাচ্ছিস কোথায়? তুই নিশ্চয় সত্যিকারের আমচোর। রাতে আম চুরি করে দিনে বাজারে বিক্রী করিস। তাই না?'

'না।'

'ফের নাকী সুরে কথা। দাঁড়া, ভূতনাথ স্যারকে ডাকছি। স্যার আমাকে আমবাগানে রাতে পাহারা দিতে বলেছেন। তাই বাগানে ঘুরছিলাম। আমচোর ধরে স্যারের হাতে তুলে দেব। এটাই আমার কাজ।'

'কেঁন গুঁল মাঁরছ ঘোঁৎনা?'

'আমার নাম জানিস! কে তুই?'

'আমাকে চিনতে পারলে না? আমরা তো একই কোচিং ক্লাসে পড়ি। আমি অরুণ', বলে অরুণ কালো বোরখা খুলে ফেলে একগাল হেসে ঘোৎনার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

'ওরে হতভাগা, তুই! কালো বোরখা পরেছিস কেন?'

'অন্ধকার কালো, বোরখাও কালো। বোরখা গায়ে থাকলে কেউ দেখতে পাবে না, তাই পরেছি। সেবার হেডস্যারের পেয়ারা গাছের পেয়ারা চুরি করার জন্য তুমি রাতে বোরখা পরে গাছে উঠেছিলে, সেই আদর্শ ফলো করেছি।'

'ইডিয়ট। আমার আদর্শ ফলো করা অত সোজা নয়। সিনেমায় দেখেছি কঙ্কাল বা ভূতেদের রঙ সাদা হয়। তাই কালো বোরখা আর পরি না। আমাকে ভূতের ভয় দেখিয়ে একাই আম লোপাট করবি ভেবেছিলি, তাই না?'

'ভূতেরাও তোমাকে ভয় পায়। মানুষ মরলে ভূত হয়। তুমি তো জ্যান্ত ভূত। হেডস্যার সেদিন তোমায় জ্যান্ত ভূত বলেছিলেন না?'

'মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস না। হেডস্যার ভূতেদের বিষয় কতটুকু জানেন! তিনটে ভূত মরলে তবে একজন হেডস্যার হয়। যাক বাজে কথা ছাড়। তোর বোরখাটা দে। ওতে আম বেঁধে নিয়ে যাব। খোল।'

'তুমি একা সব আম নেবে নাকি?'

'তোর মতো সেলফিস না। আজ বোরখায় বেঁধে নিয়ে আমগুলো আমাদের বাড়িতে রাখব। কাল সকালে দুজনে ভাগাভাগি করে খাব। নে আবার গাছে উঠে আম নিচে ফেল। আমি গাছের তলায় বোরখা পেতে দাঁড়াচ্ছি।'

'তুমি আসবার আগেই আমি গাছে উঠে অনেক আম নিচে ফেলেছি, এখন গাছতলা থেকে দুজনে মিলে কুড়িয়ে নিলেই হবে।'

'সাবাস! কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছিস দেখছি। অন্ধকারে গাছতলায় আম হাতড়ে বেড়ান অবশ্য সোজা কাজ নয়। কি আর করা যাবে।'

গাছতলা থেকে অনেক আম কুড়িয়ে দুজনে বোরখার মধ্যে বেঁধে নিল। কি মনে করে অরুণ বলল, 'এত আম শুধু আমরা দুজনেই খাব নাকি?'

ঘোৎনা বলল, 'ক্ষেপেছিস? আমার বিবেক বলে একটা কিছু তো আছে। কিছু আম আমসত্ত্ব করে পরে ভূতনাথ স্যারকে দিয়ে যাব।'

অরুণ বলল, 'বুদ্ধিটা খারাপ নয়। আমরা তো আর অকৃতজ্ঞ নই। স্যারের বাগান থেকে এত আম পেলাম, স্যারকে কয়েকটা আমসত্ত্ব চুষতে দেওয়া উচিত।'

ঘোৎনা বোরখা-বাঁধা আমের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়ে বলল, 'আর দেরি করা ঠিক নয়। চল সটকে পড়ি।'

ঘোৎনা পা বাড়াল। অরুণ তার পেছন পেছন চলল। বাগানের গেটের দিকে নয়, পাঁচিলের দিকে। দুজনেই পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকেছিল।

বেশ খুশি মনে এগোচ্ছিল দুজনে, কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াতে হলো।

'কে? বাগানে কে ঢুকেছে?' চিৎকার করতে করতে তেড়ে এলেন ভূতনাথবাবু। তাঁর এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে লণ্ঠন। সঙ্গে লাঠি হাতে গৃহভৃত্য বগরু।

টর্চের আলো ঘোৎনার মুখে পড়তেই সে মুখ ঘুরিয়ে প্রাণপণে পাঁচিলের দিকে ছুটতে লাগল। সঙ্গে অরুণ।

'চোর ঢুকেছে। ধর বগরু। ব্যাটাদের ধরে আড়নধোলাই দে', বলে ভূতনাবাবু আবার চিৎকার করে উঠলেন।

অন্ধকারে ছুটতে গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে হোঁচট খেল ঘোৎনা। তার মাথা থেকে বোরখা বোঝাই আম ধপাস করে মাটিতে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। সেদিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল দুই বন্ধু। কিন্তু তখন আর অপেক্ষা করার সময় নেই। ভূতনাথবাবু কাছে এসে পড়েছেন। কি ভেবে আমহীন বোরখা তুলে নিয়ে সেটা তাড়াতাড়ি গায়ে ঢুকিয়ে ছুট লাগাল ঘোৎনা। অরুণও যথাসম্ভব নিজেকে বোরখার তলায় গুঁজে দিল।

রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে দুই বন্ধু বাগানের পাঁচিল টপকে রাস্তায় নেমে পড়ল। রাস্তায় কিছুদূর ছোটার পর ভূতনাথবাবুর নাগালের বাইরে চলে এসেছে বুঝতে পেরে অরুণ ঘোৎনাকে বলল, 'বোরখাটা খুলে ফেল। লোকে তোমার দিকে দেখছে। আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম! এত পরিশ্রম বৃথা গেল।'

ঘোৎনা বলল, 'নিশ্চয় আয়নায় তোর নিজের মুখ দেখে উঠেছিলি। অপয়া কোথাকার।'

কথা শেষ করে ঘোৎনা বোরখা খুলে অরুণের বিষন্ন মুখের দিকে তাকাল। তারপর আবার বলল, 'দুঃখ করিস না। মাটিতে আমগুলো ছড়িয়ে পড়ার পর দুটো আম পকেটে তাড়াতাড়ি ঢুকিয়ে নিয়েছি। নে খা। পাকা টুসটুসে আম। রসে ভর্তি।'

পকেট থেকে দুটো আম বের করে ঘোৎনা একটা অরুণের হাতে দিয়ে বলল, 'এক বোরখা আমের বদলে একটা আম খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। কি আর করা যাবে। খা।'

দুই বন্ধু দুটি আম খেতে খেতে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

এখন গরম কাল। এই সময়টা একটু সাবধানে থাকতে হয়। লক্ষ্য করেছো তো কি রকম ঝড়ো হাওয়া বইছে, দুপুরবেলায় ঠা-ঠা রোদে হঠাৎ ভেসে আসে কোকিলের ডাক। বেশ লাগে, না? আর যেদিন আকাশ কালো করে মেঘের দল ডানা মেলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে লু গরমের ওপর ঠাণ্ডার প্রলেপ দেয় সেদিন আরো ভালো লাগে, তাই না? গরমের সময় আম, জাম, কাঁঠাল আরো কতো ফল যে পাওয়া যায়। প্রকৃতি নিজের পরিবার নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে সাজিয়ে রেখে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, সময়ের কাজ সবসময় ঠিক সময়েই করতে হয়। মনে রেখো প্রকৃতির চেয়ে বড় শিক্ষক আর কেউ নয়। নির্ঘাৎ ভাবছো, দাদুমণির আজ আবার কি হলো—এ সব কথা বলছে কেন? বলো তো কেন? ভাবো, ভেবে ভেবে যার যা মনে আসবে আমায় লিখে জানাবে। দেখি শুকতারার বন্ধুরা কে কি বলে?

এবার শোন তোমাদের একটা দরকারী কথা বলি। তোমরা ম্যাগেলানের নাম শুনেছো তো? ম্যাগেলান একটি অন্তরীক্ষ যান। ১৯৮৯ সালের মে মাসে আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে ম্যাগেলানকে শুক্র গ্রহের আকাশে পাঠানো হয়েছিলো গ্রহটিকে ভালো করে দেখে তার রিপোর্ট পৃথিবীতে পাঠানোর জন্যে। তা এতোদিনে ম্যাগেলান কিন্তু কম কাজ করেনি। পুরো শুক্র গ্রহটিকে জরিপ করে তার মানচিত্র তৈরি করে ফেলেছে। জরিপ করার সময় ম্যাগেলান শুক্রের বুকে পেয়েছে অসংখ্য জ্বালামুখ, উপত্যকা, খাঁড়ি ইত্যাদি। এর সংখ্যা ইতিমধ্যেই চার হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এখন মুশকিল হয়েছে কি জানো—ভালোভাবে একটা মানচিত্র তৈরি করতে হলে ঐ সব জ্বালামুখ, উপত্যকা, খাঁড়ির আলাদা আলাদা নাম দিতে হবে। ব্যাপারটা মোটেই সোজা নয়। তাই বিজ্ঞানীরা এই নামকরণের ব্যাপারে সকলের সাহায্য চাইছেন। শুকতারার বন্ধুরা যদি বিজ্ঞানীদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে শুক্র গ্রহের জ্বালামুখ, উপত্যকা, খাঁড়ির নামকরণ করো এবং ওঁদের কাছে পাঠিয়ে দাও তাহলে আমি ভীষণ আনন্দ পাবো। করবে নাকি? আমি জানি, তোমরা সক্কলে এক কথায় রাজী হবে। হাজার হলেও সৌরবিজ্ঞানীরা নামকরণের জন্যে তোমাদের কাছে সাহায্য চাইছেন তো! তবে নাম দেবার সময় কয়েকটা কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে। যেমন নাম হবে কোনো মহিলার নামে। তিনি গল্পকথার কিংবদন্তী চরিত্র, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা আধুনিক চরিত্রও হতে পারেন। কিন্তু রাজনৈতিক, ধর্মীয় নেতা কিংবা আধুনিক কোনো সৈনিকের নামে নামকরণ করা চলবে না। তুমি যাঁর নামে নামকরণ করতে চাইছো তাঁর সম্বন্ধে দু লাইন লিখে দিতে হবে আর যে বই থেকে নামটা পেয়েছো (যেমন ধরো মহাভারত, বেদ, পুরাণ) তার নামটাও দিতে হবে। সেই সঙ্গে তোমার পুরো নাম, ঠিকানা, বয়স, স্কুল বা কলেজের নাম দিয়ে দেবে। তোমার দেওয়া নাম ওঁদের পছন্দ হলে ওঁরা তোমায় জানিয়ে দেবেন। হয়তো তার জন্যে কিছু উপহারও পাবে। তোমাদের দেওয়া নাম বিজ্ঞানীদের পছন্দ হলে সে খবর কিন্তু আমায় সঙ্গে সঙ্গে জানাবে। আমিও শুকতারার বন্ধুদের জানিয়ে দেবো। যে ঠিকানায় নাম পাঠাবে—

Venus Names
Magellan Project Office, Mail Stop 230-20
Jet Propulsion Laboratory,
4800, Oak Grove Drive, Passadena CA 91109, USA

এক কাজ করো, বাড়িতে বড়দের সঙ্গে কথা বলে নাও। আমাদের বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত কিংবা ইতিহাসের বইতে হাজারো নাম ছড়িয়ে আছে। সহজেই পছন্দমত নাম পেয়ে যাবে। সে যাই হোক, শুকতারা এখন কেমন লাগছে তাই বলো। নিশ্চয়ই আগের চেয়ে ভালো। একটা করে সম্পূর্ণ উপন্যাস তো এখন প্রত্যেক সংখ্যায় পাচ্ছো। কেমন লাগছে জানিও। সেই সঙ্গে জানিও আরো নতুন যদি কিছু চাই।

স্বপনবুড়ো আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন জানো তো। স্বপনবুড়ো শুকতারার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কি সুন্দর যে গল্প বলতেন। একবার ওঁর একটা রেকর্ড বেরিয়েছিলো—আমি স্বপনবুড়ো বলছি। আমরা সেই রেকর্ড শুনে এক নতুন রাজ্যে চলে যেতাম। ছোটদের সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন তিনি। 'সব পেয়েছির আসর' প্রতিষ্ঠা করে উনি ছোটদের যে কি উপকার করে গেছেন তা বলে বোঝানো যাবে না। তোমরা যারা ওঁর লেখা পড়োনি পারলে সংগ্রহ করে পড়ে নিও। দেখবে কি ভালোই না লাগবে।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই।

ভালো থেকো সকলে।

অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয় হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

শ্রীময়ী মুখার্জী,
বয়স আট, দ্বিতীয় শ্রেণী,
প্রাট মেমোরিয়াল স্কুল,
কলকাতা।

টমি আর পুষির মিতালি

আমার পোষা কুকুর 'টমি' আর দিদার আদরের 'পুষি'র মধ্যে একেবারে ভাব নেই। টমি পুষিকে দেখলেই দাঁত বার করে 'ঘেউ ঘেউ' করে তাড়া করে। ভাবটা যেন, 'আয় না একবার, লড়ে যাই।' পুষিও একলাফে পাঁচিলে উঠে পড়ে। বসে বসে রোদ পোহায়, আর আড় চোখে টমির দিকে তাকায়। ভাবটা যেন, 'যাঃ যাঃ, তোর ক্ষমতা আমার জানা আছে।'

সত্যি কথা বলতে কি টমি পুষিকে হিংসে করে। কারণ পুষি ঘরে-দুয়ারে ঘুরে বেড়ায়, দিদার পাতের দুধ-ভাত খায়, এমনকি ঠাকুর-ঘরেও তার অবারিত দ্বার। আর বেচারা টমিকে দিদা একেবারে দেখতে পারেন না। ঘরে তো দূরের কথা, বারান্দাতেও উঠতে দেন না। পুষি তাই বেশ জমিদারী মেজাজে চলাফেরা করে। আর টমি ঘুমিয়ে থাকলে ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় থাবা দিয়ে এক চড় মেরে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে টমির দিকে তাকিয়ে যেন বলে, 'কেমন মজা আর আমার সঙ্গে লাগবি?'

একদিন দেখি পুষির দুটো সাদা সাদা বাচ্চা হয়েছে। পুষি ঘুঁটে-কয়লা রাখার ঘরে আস্তানা নেয়। ছোট তুলোর বলের মতো বাচ্চাগুলোর এখনও চোখ ফোটেনি। দিদা বলেন, 'তোদের কুকুর না বাচ্চাগুলোকে মেরে দেয়।'

হঠাৎ সেদিন সকালে মা আর্ত চীৎকার করে ওঠেন। সকলে ছুটে গিয়ে দেখি, মা সেই ঘুঁটের ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। পুষি আর তার একটা বাচ্চা নেই। অন্য বাচ্চাটা 'মিউ মিউ' করছে। আর ঘরের মধ্যে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক বিষধর গোখরো সাপ। পুষির বাচ্চাটার উপর সাপের ছোবল পড়লো বলে। এমন সময় কোথা থেকে টমি ছুটে এসে ঘরে ঢুকে পড়লো আর অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় পুষির বাচ্চাটাকে মুখে তুলে নিয়েই বাইরে চলে এল। হিস্ করে এল গোখরোর ছোবল। তবে না, টমি বেঁচে গেল। ইতিমধ্যে পুষিও ছুটে আসে। মুখে তার আর একটা বাচ্চা। টমি অপর বাচ্চাটাকে পুষির কাছে নামিয়ে দেয়। তারপর বাড়ির কাজের লোক রামদীন অনেক কষ্টে সাপটাকে মারলো।

দুপুরবেলা দেখি টমির পাশে শুয়ে পুষি বাচ্চাগুলোকে দুধ খাওয়াচ্ছে। আর টমি তাকিয়ে আছে বাচ্চাগুলোর দিকে। ঘন ঘন লেজ নেড়ে যেন বলছে,'আজ থেকে তোর আমার মিতালি।'

সুদীপ্ত চ্যাটার্জী, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
আঝাপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বর্ধমান।

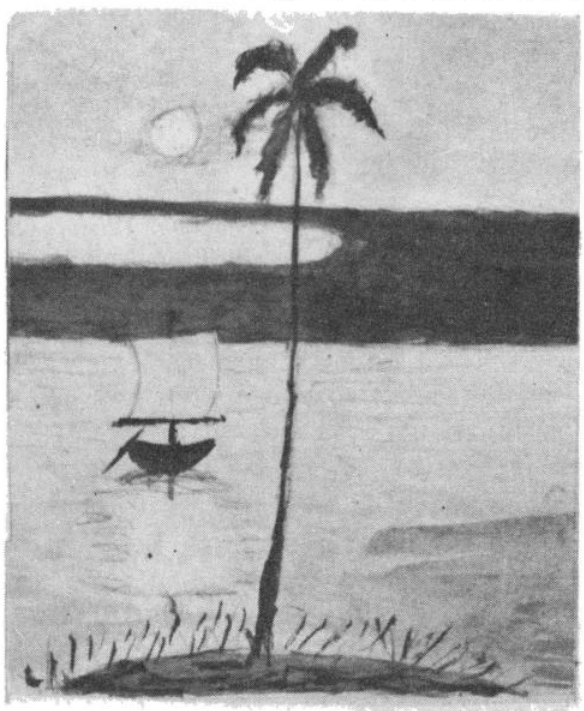

রাজেশকুমার, বয়স নয়, পঞ্চম শ্রেণী,
নীতা বিদ্যাপীঠ বারগান্ডা, গিরিডি

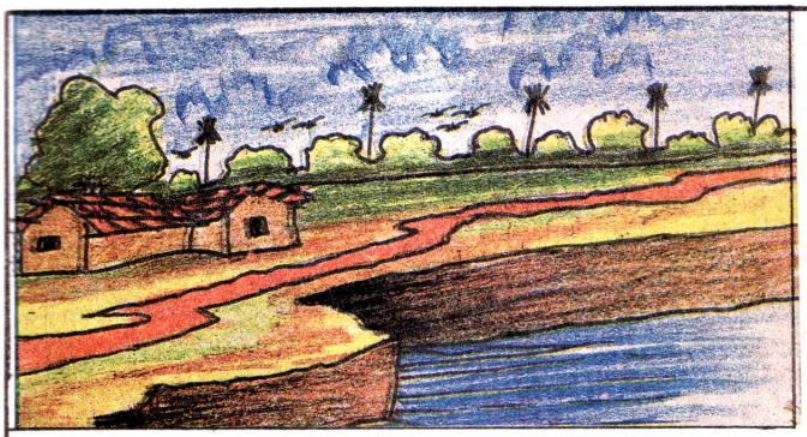

সোমক পাল, বয়স ছয়, প্রথম শ্রেণী, শশীবালা সাহা প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, কালনা

সৌম দাস, বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণী,
খেলাঘর নার্সারী স্কুল, মালদহ।

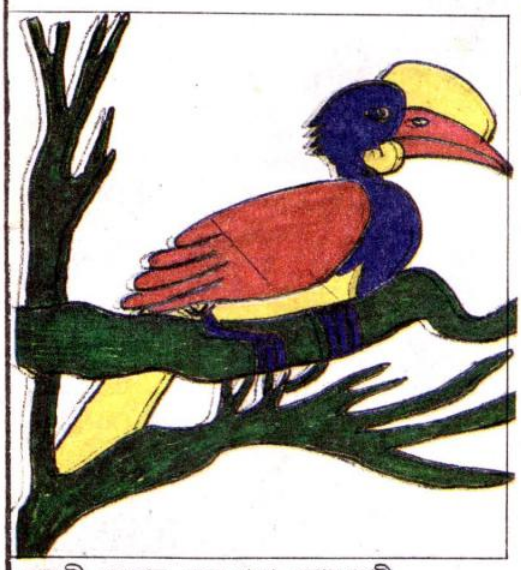

সায়ন্তী সরকার, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী,
কুইন অফ দ্য মিশন স্কুল, কলকাতা

মা আমার

মনটা যখন ঘরের কোণে
একলা বসে চুপটি করে
মনের মানুষ খোঁজে
তখন তোমায় মনে পড়ে।
স্বপ্নচোখে অবাক হয়ে
যখন তোমায় দেখি,
তুমি তখন দূর আকাশে
উড়ছ হয়ে পাখি।
তোমার কোলে মাথা রেখে
ছিলেম যখন শুয়ে,
কখন তুমি পালিয়ে গেলে
সাঁজের প্রদীপ হয়ে?
তুমি মাগো আমায় ছেড়ে
কোথায় গেলে চলে?
কার কোলে মা ঘুমাই এখন
ডাকি কাকে মা বলে?

অঞ্জন দাস,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
কানাইলাল বিদ্যামন্দির
চন্দননগর, হুগলি।

প্রিয়াংকা বিশ্বাস,
বয়স সাত, দ্বিতীয় শ্রেণী,
ইন্দিরা গান্ধী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মাজদিয়া, নদীয়া।

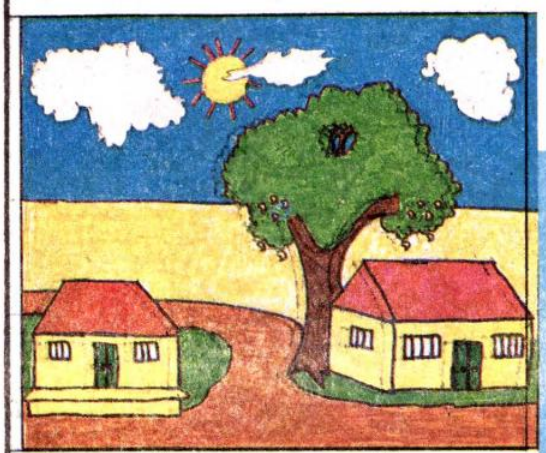

শুভঙ্কর চৌধুরী, বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী,
হিন্দু বিদ্যালয়, কলকাতা

চিড়িয়াখানা

গিয়েছিলাম চিড়িয়াখানায়
সেদিন শীতের বেলা।
সেথায় দেখি পশুপাখি
করছে কত খেলা।
সিংহমামা চুপটি করে
আছেন খাঁচাটিতে।
বনমানুষের মাথায় বড়ো
লাল রঙের এক ফিতে।
বাঘের খাঁচায় গিয়ে দেখি
মুখটি যে তার ভার।
মাংস বোধহয় পায়নি বেশি
কিংবা কিছু হাড়।

মনোমিতা দত্ত, বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী, সূত্রাগড় গার্লস হাই স্কুল।

বিদ্যালয়ে বিভ্রাট—ময়ূখ চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঈস্! উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চেপেছে! এখন কি করি?... এই ব্যাপারটা কিছুতেই সামলানো যাবে না। আমারই দোষে তপেন আর অন্য ছাত্ররা অপদস্থ হবে – স্কুলেরও বদনাম।

আমার শিক্ষক

!?

নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে চমকে গেল সবাই – সবচেয়ে বেশি চমকে উঠল দেবাশিস...

এটা কি বস্তু মশাই?

ওঃ হো, এবার বুঝেছি – FANTASTIC! কী দারুণ কল্পনাশক্তি – শিক্ষকের মাথা নেই – মাথার বদলে রয়েছে ঘড়ি – ঐ ঘড়ির উপর উঠেছে একটি যুদ্ধজাহাজ! অর্থাৎ ছাত্ররা ঘড়ির মতো নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুবর্তী হবে এবং যুদ্ধজাহাজের মতো দুর্বার বেগে অগ্রসর হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে...

কী সুন্দর পরিকল্পনা! আমি কোন বিদ্যালয়ে ছাত্রদের কাছে এমন গভীর চিন্তাশক্তির প্রকাশ দেখতে পাব বলে আশা করি নি। আপনার ছাত্ররা আধুনিক চিত্রশিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে সন্দেহ নেই।

উরে ব্বাস! আমার ছাত্রদের যে এত কেরামতি তা তো জানা ছিল না। তবে উনি হলেন আধুনিক চিত্রকলার বিশেষজ্ঞ, ওঁর কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই অসাধারণ অনবদ্য চিত্রশৈলী – MODERN ART বা আধুনিক চিত্রকলার একটি অপূর্ব নিদর্শন। বালকের মুখ দিয়ে সমগ্র ছাত্রসমাজকে বোঝানো হয়েছে, – শ্যামল প্রান্তর তারুণ্যের প্রতীক, আর বৃক্ষ হচ্ছে সহিষ্ণুতার শরীরী প্রতিচ্ছবি।

শিক্ষক

ও-ইয়ে-সত্যি?... ছাত্রেরা এত সব ভেবে কাজ করেছে? আমরা অবশ্য ছাত্রদের শিল্পচর্চায় যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে থাকি।

আধুনিক চিত্রশিল্পের দৌলতে এ-যাত্রা বিপদ কেটে গেল। ভেলকির খেলায় জিনিসগুলো উল্টোপাল্টা আঁকতে গিয়ে যে আধুনিক চিত্রশিল্প গড়ে তুলবে তা ভাবতেই পারি নি। কিন্তু আমার কাজ বাড়ল। কাগজগুলো ছেঁড়ার দায়িত্ব নিয়েছি, অতএব সেই কাজটা করতেই হবে। এইবার আমি ভেলকির সাহায্য নেব না, হাতে করেই ছিঁড়ব। তাতে দেরি হবে বটে, কিন্তু নতুন কোন বিভ্রাটের সৃষ্টি হবে না। কে যেন বলেছিল – SLOW BUT STEADY WINS THE RACE.

কাঁচিতে ভেলকি লাগিয়ে যে-সব কাগজ কাটা হয়েছিল, পরবর্তী ভেলকিতে সেগুলো জুড়ে গিয়ে দেবাশিসের পরিশ্রম বাড়িয়ে দিল...

৫-৪

দুই বন্ধুর পরবর্তী অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী

"যুগ-যুগান্তের যাত্রী"

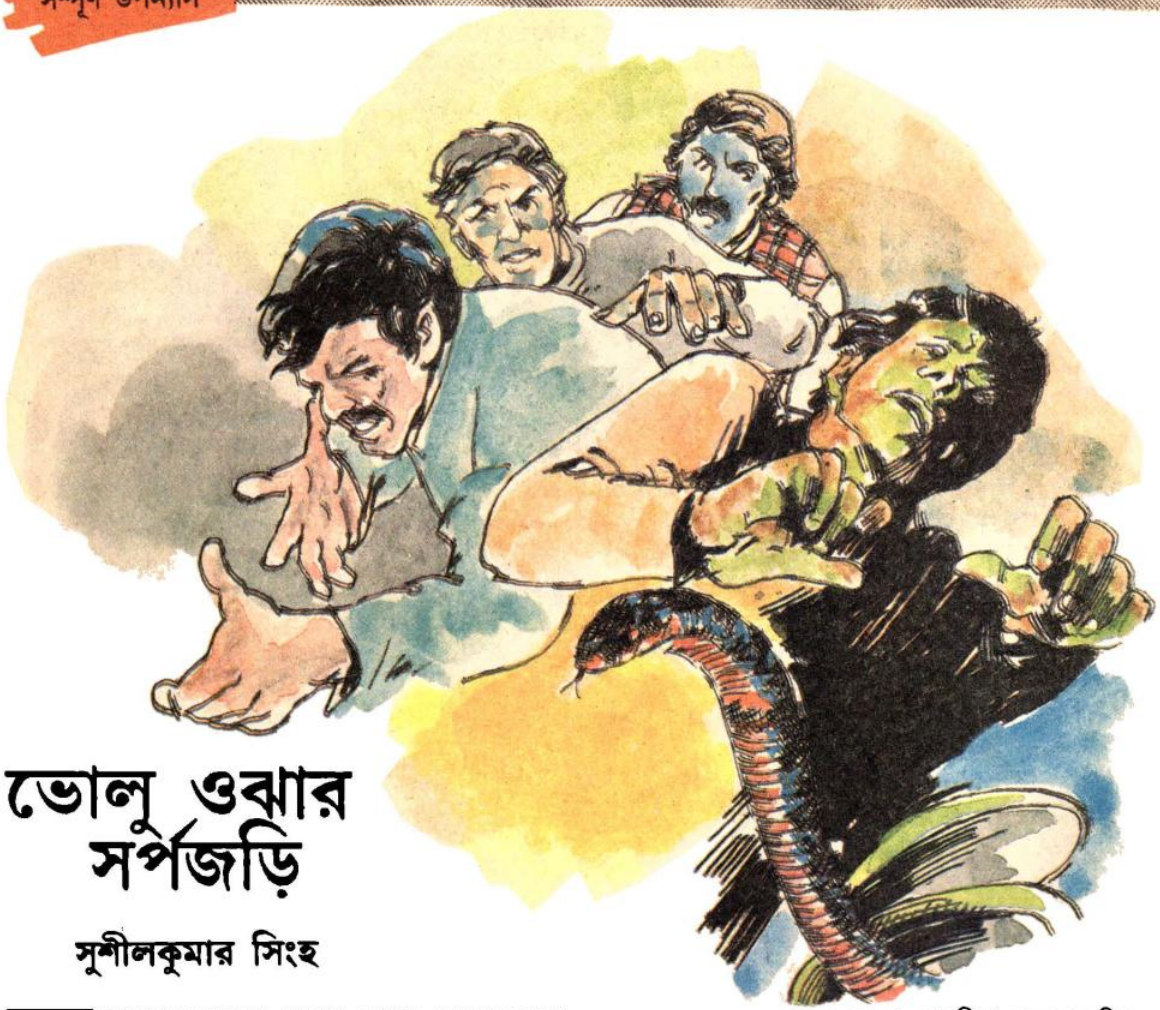

ভোলু ওঝার সর্পজড়ি

সুশীলকুমার সিংহ

মনসা পুজোর মেলায় জমেছে সাপের খেলা। ঢ্যামনা, গোখরো, খরিশ-চিতি, শঙ্খচূড়, বোড়ো, শাঁখামুঠি নানা ধরনের নানা জাতের সাপ। জলজ্যান্ত কাল সব। অথচ সেই কালকেই তুচ্ছ করে যে যার দেখাচ্ছে কারসাজি। কারসাজি দেখাবারই ক্ষেত্র এটা। তিলাবদ্যা গ্রামের মনসা পুজোর মেলার বৈশিষ্ট্যই হলো তাই। নিজ-গাঁ, ভিন-গাঁ, বাছবিচার নেই, বাধা নেই উচ্চনিচ বর্ণের বা ভিন্ন ধর্মের হতে। শ্রাবণ সংক্রান্তির পর মাখল-পান্তার দিন সবার জন্য মায়ের পুজোমণ্ডপ খোলা। এই খোলামেলা আসরে একবার নাম করতে পারলে গোটা বাঁকুড়া জেলায় সাপের গুণী হিসাবে ছড়িয়ে পড়বে তার পসার। ওঝা হিসেবে জমে উঠবে তার খ্যাতি। সেই পসার-প্রতিষ্ঠা আর নাম-যশের লোভেই বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তর থেকে এ আসরে এসে জমা হয় ওস্তাদ ওঝার দল।

ভোলানাথের অনেক দিনের ইচ্ছে, এ মেলায় একবার নামটা দেওয়ার। প্রতি বছর সে এ আসরে ঘুরঘুর করছে, নানা গুণী ওস্তাদের খোসামোদ করে এ গুহ্যবিদ্যার অনেক কিছু আয়ত্ত করেছে সে, কিন্তু সাহস হয়নি। আজ যখন হঠাৎ পদু রায়কে এ আসরে সাপ খেলাতে দেখল ভোলু, তখন অনেক দিনের শখটা তার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। পদু গুরুস্থানীয় নয়, বলতে গেলে সে তার স্যাঙাৎ। ব্রজ গোঁসাই-এর শিষ্য তারা উভয়েই। সতীর্থ হয়ে পদু যদি আসর নিতে পারে, তবে সে পারবে না কেন? এ তল্লাটের শ্রেষ্ঠ গুণিন ব্রজ গোঁসাই। তাঁর বিদায়বেলায় আশীর্বাদের কথা মনে পড়ল ভোলানাথের, বাবা ভোলানাথ, তোকে আমি আমার সব বিদ্যা উজাড় করে দিয়েছি। তুই কিন্তু এর সম্মান রাখবি। সম্মান রাখবার এই তো উপযুক্ত ক্ষেত্র। সত্যি গুরু তাকে পদুর চেয়েও বেশি কিছু উজাড় করে দিয়েছেন কিনা সেটা যাচাই করবার এই তো উপযুক্ত সময়। সাহসের উপর ভর করে তাই বলে উঠল ভোলানাথ, আসর নেব আমি।

পদু তখন তন্ময় সাপ খেলানোতে। এক-আধটা সাপ নয়, সপ্তনাগের মাঝে বসে সে হাঁটু দুলিয়ে মুঠো ঘুরিয়ে ফণা দুলানো

করাচ্ছিল সাত-সাতটা কালনাগকে। মুখে ছিল তার সুর—

ও সাপ শুনরে শুনরে, দাঁড়ে কর রে ভর,
(আর) এমনভাবে খেল, ওরে দেখিতে সুন্দর।
ও সাপ.....

ঘুঙুর-বিষমঢাকীর তালে ধুয়া গেয়ে দোয়ারকি করে চলছিল তার দোয়ারগণ, ও সাপ খেলরে খেলরে সভার মাঝারে।

সত্যি দেখবার মতো চলছিল খেলা। বিষমঢাকীর সুরে তালে যেন মজে গেছল সাপগুলো। ফণা দুলিয়ে ঘুরে ফিরে যেন তারা মাতিয়ে রেখেছিল খেলুড়িকে। তাই প্রথম কথাটা মনে হয় কানে যায়নি পদুর। ভোলা মাত্রা বাড়িয়ে তাই আবার হেঁকে বসল, আসর চাই আমি।

কথাটা বোধহয় এবার পদুর কানে ঢুকল। একই গুরুর শিষ্য হলে কি হবে, মুখ দেখাদেখি ছিল না তাদের। আড়াআড়ি সেই শিক্ষাকাল থেকেই। তাই ভোলুর কথাটায় আমল দেবে কি, সে তাকে গ্রাহ্য না করে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে বলে উঠল, বড় বড় গেল রথী, আর ভৈরবতলায় এল চক্কবর্ত্তী। খেলা দেখতে এসেছ খেলা দেখ, মিছিমিছি প্রাণটা নিয়ে কেন বাহাদুরি করতে আসছো?

হো হো করে হেসে উঠল পদুর সঙ্গীসাথীরা।

এত বড় অপমান! রাগে কাঁপতে লাগল ভোলানাথের সর্বাঙ্গ। বেশ চড়া সুরে বলে উঠল পদু রায়কে, আসর ছাড়তে বলছি আসর ছাড়। মুখচাটিতে গুণীকে আটকানো যায় না। হিম্মৎ থাকে তো আসরে আমাকে ঠেকা।

কি, এত বড় কথা! সভার মাঝে তাকে উঠতে বলা। চটে উঠল পদু রায়। গর্জে বলল তাকে, গুণী বটিস তো চালানে সাপগুলোর খেলন বন্ধ করে দে, দেখি কেমন বাপের বেটা!

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল ভোলু। বলল, মা মনসার পূজার আনন্দে তাঁর সন্তানদের খেলন আমি বন্ধ করতে চাইনি পদা। সোজাসুজি তোর কাছে আসর চাইছি আমি। তোরই সাপ নিয়ে খেলিয়ে সভার মাঝে সকলকে দেখাতে চাই যে বিষদাঁত ভাঙা কতকগুলো সাপকে খেলিয়ে সবাই বাহাদুরি দেখাতে পারে।

জ্বলন্ত আগুনে যেন ঘি পড়ল। কি, আমি বিষদাঁত ভাঙা সাপকে নিয়ে খেলা দেখাই! জানিস, বিষ্ণুপুরের বাঘ-ঝাপানে চড়ে খেলা দেখাই আমি? ছান্দাড়-অযোধ্যার কালুবুড়ীর থানে প্রতি বৎসর দশহরার ডাক আসে আমার। গর্জে গর্জে পদু একের পর এক তার বাহাদুরির কথা বলেই চলল।

ভোলু কিন্তু ঘাবড়াল না তার কথাতে। সে চাইতেই লাগল আসর। নিয়ম এখানে, আসর চাইলেই দিতে হবে তাকে। পদুকে তাই উঠতে হলো আসর ছেড়ে।

গুঞ্জন শুরু হলো আশপাশে। সত্যিই বুকের পাটা আছে লোকটার। নইলে পদু রায়ের মতো ওস্তাদ আসর ছাড়বে কেন! কৌতূহলে উপচে উঠল গাদাগাদি ভিড়। গুরুকে স্মরণ করে আসরে নামল ভোলু। গণেশাদি পঞ্চ দেবতার বন্দনা গেয়ে, বাসুকি নাগের ভগিনী জরৎকারুর পত্নী মা মনসাকে করজোড়ে ভক্তিভরে আবাহন করল ভোলু তার আসরে।

একবার এসো মা, এসো মা আমার আসরে—
ধুলায় পড়ে কাতর হয়ে ডাকি মা তোমারে।
একবার এসো মা

বাজাতে লাগল বিষমঢাকী। উঠতে লাগল সুর। জমতে লাগল খেলা। একরাশ স্থানবন্দি কালবন্দি দেহবন্দন মন্ত্রে নিজের সব দিক সামলে আসরে নেমেছিল ভোলানাথ। তাই চারপাশের নানা ওস্তাদের কুপোকাৎ করার মন্ত্রগুলো পর্যুদস্ত করতে পারল না তাকে। এমনকি পদু রায়ের দেহবন্ধন আলগা করার মন্ত্র, স্থানচালা, চোখচালা, ঝাড়ন কাটন কিছুতেই কোনোভাবে টক্কর দিতে পারল না ভোলানাথকে। দিব্যি বিষমঢাকীর গমকে গা দুলিয়ে জাতগান ফেঁদে খেলিয়ে চলল সে ফণাধরদের।

তারিফ করতে লাগল সবাই। চারধার থেকে বর্ষিত হতে লাগল 'সাবাস-বাহবা' ধ্বনি। হঠাৎ দলবল নিয়ে সমস্বরে পদু ছুঁড়ে মারল এক চালনমন্ত্র—

চালথা চাকা চাকা কুমড়োর ফুল,
হুড়পির ভিতরে সাপা বেঁত (মুখ) বাইয়ে (হাঁ করে) বুল।
হাত পেলে হাত খাবি পা পেলে পা খাবি
না খাসতো মা মনসার মাথা খাবি—
কার আজ্ঞা? মা মনসার আজ্ঞা...

উঠে দাঁড়াল ভোলু। খেলন্ত সর্পকুলের মাঝে হেঁকে উঠল সে তার কাটান মন্ত্র—

কু কাটি কুমন্ত্র কাটি, কাটি বাইরে ঘরে—
সবার মুখের কুচালন কাটি মা মনসার বরে...

পরস্পর উতর-চাপানে, চালন মন্ত্রে কাটান বাণে জমে গেল আসরটা। কোনোমতেই পদু ভোলানাথের আসর নষ্ট করতে না পেরে হঠাৎ কোত্থেকে তার লুকিয়ে রাখা বিষদাঁত না-ভাঙা একটা খরিশ ছুঁড়ে দিল ভোলুর দিকে। গুণী জব্দ করতে এমনি দু-একটা দাঁত না-কামান বিষধর লুকিয়ে রাখে ওস্তাদরা। বিষধর ভোলানাথকে ছোবল মারল কিনা কে জানে, তাড়াতাড়ি সে কোমরের গোঁজে থেকে কি এক টুকরো শিকড় বের করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। তারপর পদু রায়ের দিকে তাকিয়ে হেঁকে উঠল, এমন লুকিয়ে-ছাপিয়ে কেন, সামনা-সামনি আয়।

অন্যমনস্ক হতেই কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল ভোলানাথের। খেলা ছেড়ে হিলহিলে সাপগুলো কিলবিল করে মুখ হাঁ করে ছুটে আসতে লাগল তার দিকে। সব মন্ত্রই তার ওলট-পালট হয়ে যেতে লাগল। সাপ নাচানোর নির্দিষ্ট চাল-পদ্ধতি গুলিয়ে যেতে লাগল। ছোবল এড়াতে চোখের পাহারাদারী ক্ষিপ্রতা কৌশল বেহাল হতে লাগল তার। শেষে নাজেহাল হয়ে ছাড়তে

আমি বিষদাঁত ভাঙা সাপকে নিয়ে খেলা দেখাই!

বাধ্য হলো সে আসর।

হেসে উঠল পদু রায়। কি বিদ্‌ঘুটে তার হাসি। টিট্‌কারী দিয়ে বলল, বুলবুলি হয়ে ডুমুর গেলা। পদু রায়ের আসর নিবি তুই, এত বড় হিম্মত? একই গুরুর শিষ্য বলে তোকে আজ ছেড়ে দিলাম। এর পর আর যদি তুই কোনোদিন আমার উপর ওস্তাদি দেখাতে আসিস সেদিন জীবন নিয়ে আর ফিরে যেতে দেব না। মনে থাকে যেন।

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল ভোলানাথের। ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে আর এক মুহূর্তও সে দাঁড়াল না সেখানে। যত রাগ পড়ল তার গুরু গোঁসাই-এর উপর। উনিই তো বলেছিলেন। আমার সব বিদ্যে তোকে উজাড় করে দিলাম ভোলু...।

সব ভাঁওতা ধাপ্পাবাজি। পদুকেই তাঁর সমস্ত বিদ্যা উজাড় করে দিয়ে শুধু মিথ্যে কথায় ভুলিয়ে তাকে বিদায় করেছেন।

গনগনিয়ে চলে এল সে কাঁটাবাইদ। সোজা গুরুর ঘরে ঢুকে ব্রজ গোঁসাইকে তাঁর মনসামেলায় বসে থাকতে দেখেই ক্রোধে যেন ফেটে পড়ল ভোলানাথ। কোনো ভূমিকা না করে বলল, এভাবে ধোঁকা দেওয়ার কি মানে ছিল? সেদিন তো স্পষ্ট বলতে পারতেন আমাকে যে পদু আপনার প্রিয় শিষ্য। সব বিদ্যে উজাড় করে পদুকে দিয়ে আমাকে অপমান করার জন্য মিথ্যে বলে বিদেয় করলেন যে, তুই আমার সম্মান রাখ ভোলু।

গোঁসাই ঠাকুর তো আকাশ থেকে পড়লেন। শান্তশিষ্ট ভদ্র ভোলানাথ হঠাৎ এমন রুদ্র ভৈরব হলো কেন? যখন শুনলেন পদু রায়ের কাছে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে রেগে এসেছে ভোলু তাঁর কাছে, তখন তার ক্ষোভটাকে শান্ত করার জন্য বললেন, শোন ভোলু, বল-বিড়াবিড়ির বিদ্যা তোদের কাকেও আমি দিইনি। ওতে অমঙ্গল হয়। জগতের কারো কোনো কল্যাণে লাগেনি সে বিদ্যা।

আবার ভোলাচ্ছেন আমাকে? রেগে বলে উঠল ভোলানাথ, পদু তাহলে ওই মারণ চালন বিদ্যেগুলো পেল কোথা থেকে?

তা আমি জানি না, বলেন ব্রজ গোঁসাই, তবে আড়াআড়িতে যাবার আগে আমার অনুমতি নিয়ে যেতে হতো তোকে। তিলাবেদ্যার ঝাঁপান আসরে বিদ্যে পরখ করে লড়াই জমাতে যাওয়া উচিত হয়নি তোর। সেখানের বাঁচা-মরা শুধু একক গুণীর বিদ্যাবুদ্ধিতেই নির্ভর করে না তা জানিস? ঘরের মা-বৌদেরও উড়ন-কাটন বিদ্যের উপর ওস্তাদের জেতা-বাঁচা নির্ভর করে। আসরে নামার শখ ছিল তো আমাকে জানিয়ে গেলেই পারতিস।

ভোলুর মাথায় তখনও আগুন জ্বলছে, গুরুর কথার গুরুত্ব বোঝার মতো কান তখন তার থাকলে তো! বলে উঠল সে, ওসব আমি কিছু শুনতে চাই না। পদুকে সব মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়ে বড় করবেন, না আমাকেও সব বিদ্যে দেবেন, স্পষ্ট বলুন।

পদু ওসব বিদ্যা নিশ্চয়ই অন্য কোনো গুরুর কাছে যোগাড় করেছে ভোলু, গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন ব্রজ গোঁসাই। তাতে আমার আপত্তি নেই। বিদ্যের যেমন শেষ নেই তেমনি কোনো শিষ্যকে আটকে রাখায় গুরুরও অধিকার নেই। সে নিষ্ঠা, একাগ্রতা, অধ্যবসায়ে নিজ জ্ঞান বাড়িয়ে চলুক এটা আমি চাই।

তা হলে আপনার বিদ্যেবুদ্ধি এখানেই শেষ? এ কথাটা তো আগেই বলতে পারতেন, তাহলে আমিও অন্য গুরু ধরতাম। ঠিক আছে, চললাম আমি। বলেই ভোলু বেরিয়ে এল গুরুর ঘর থেকে।

অন্তরে ভোলুর আগুন জ্বলছিল। প্রতিহিংসার আগুন! যতদিন না ওই পদু রায়ের থোঁতা মুখ ভোঁতা করতে পারছে, ততদিন এ আগুন নিভবে না তার। কিন্তু কোথায় এমন গুরু আছেন, যাঁর শরণাপন্ন হলে গায়ের জ্বালাটা ঠাণ্ডা হবে! ভাবতে লাগল ভোলু। খুঁজতে লাগল সে হন্যে হয়ে। শেষে সীতু রায় দিল তাকে সৎযুক্তি। সর্পবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা। এর আদি পীঠস্থান কামরূপ কামাক্ষা। এ বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে তাকে যেতে হবে সেই কামরূপ কামাক্ষামায়ীর থান। সেখানের তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে এখানে এসে দাঁড়ালে ওই পদু রায়ের মতো চুনোপুঁটি বাপ বাপ বলে ভয়ে পালাবে।

কথাটা বেশ মনে ধরল ভোলুর। যাবে সে কামরূপ। যথাসর্বস্ব যাক তার, যত কষ্ট হোক, ওই তিলাবেদ্যার আসরে দাঁড়াবেই সে গুণীর গুণী শ্রেষ্ঠ গুণী, বড় ওস্তাদ হয়ে। পাঠিয়ে দিল সে তার বৌ আর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি। বিক্রি করল জমি-জায়গা। তারপর একটা শুভ দিন দেখল বেরিয়ে পড়ার জন্য।

ঠিক করেছিল নিশিভোরে সবার অলক্ষ্যে যাত্রা করবে সে।

উন্মাদনায় ঘুম আসছিল না ভোলুর। আশাভরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি এঁকে চলছিল তার চোখ দুটো অন্ধকার ঘরের কড়িকাঠের পটে। রাত তখন কতটা হবে কে জানে? সমস্ত পৃথিবী যেন নিদ্রামগ্ন। হঠাৎ কানে এল তার একটা ডাক, ভোলু আয়, আয় ভোলু।

চমকে উঠল ভোলানাথ! এত রাতে কারো আসার তো কথা নয়। তবে?

আয় ভোলু, বেরিয়ে আয় ঘর থেকে।

আবার সেই ডাক। একবার নয়, বারবার। উঠে বসে কান খাড়া করে বেশ ভালভাবে মন দিয়ে শুনতে লাগল ভোলু।

বসে রইলি কেন? আয় আমার কাছে। আবার সেই আহ্বান।

এ তার গুরু গোঁসাই-এর কণ্ঠস্বর। চিনতে এতটুকু ভুল হবে না তার। দরজা খুলে বেরিয়েই দেখে যা ভেবেছিল তাই। গুরুদেব তার সামনে দাঁড়িয়ে সহানুভূতির স্বরে ডাকছেন তাকে, আয় আমার সঙ্গে।

কেমন যেন লজ্জিত হলো ভোলানাথ। সত্যিই সেদিনের আচরণটা অন্যায় হয়ে গেছে। যতই হোক গুরু তিনি। যাচ্ছে সে কামরূপ কামাক্ষা। যাবার আগে অন্তত তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে আসা উচিত ছিল। সে এগিয়ে যেতেই গুরুদেব মুখ ফেরালেন। বললেন, সঙ্গে আয় আমার।

কোথা প্রভু? হাতজোড় করে বলে উঠল ভোলানাথ।

উত্তর দিলেন ব্রজ গোঁসাই, আমার সব বিদ্যে এখনও শেষ হয়নি। তাই তোকে আমি দিতে এসেছি এই মুহূর্তে।

কিন্তু আমি যে কামরূপ কামাক্ষা যাবার ঠিক করেছি প্রভু।

কোথাও যেতে হবে না তোকে। গুরু গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, আজ তোকে আমি এমন একটা জিনিস দেব যা তন্ত্রমন্ত্রের চেয়েও অনেক বড়। গুণীর গুণ, ওস্তাদের মার সব হেরে যাবে তার কাছে। আয় আমার সঙ্গে।

চলতে লাগল ভোলু। মন্ত্রমুগ্ধের মতো গুরুকে অনুসরণ করে পেরিয়ে গেল গ্রাম, ছাড়িয়ে গেল মাঠ। মাঠ পেরিয়ে বুনোতড়া। সেই তড়ার শেষে জঙ্গলের মাথায় ছিল বনপুকুর নামে এক দীঘি। সেই বনপুকুরের গাছগাছালি ভরা পাড়টায় এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। সামনে একটা উইঢিপি। ঢিপির পাশেই ঝাঁপালো শেওড়া গাছটায় অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে। গাছগাছালির ঝিঁঝি পোকাগুলো তাদের একটানা সুরে জমজমাট করে রেখেছিল জায়গাটাকে।

গুরুদেব বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, চিনে রাখ স্থানটা। বনপুকুরের ঈশান কোণের পাড়, শেওড়াতলার উইঢিপি, থাকবে তো মনে তোর?

হাঁ, প্রভু। বিনীতভাবে বলল ভোলু, কিন্তু এত রাতে আমাকে এখানে কেন আনলেন গুরুদেব?

কোথাও যেতে হবে না তোকে।

আনলাম কামাক্ষারও বড় শক্তি একটা জড়ি দিতে। বলে উঠলেন ব্রজ গোঁসাই। দেখে রাখ জড়িটা। উইঢিপিটার ঈশান কোণে ওই যে শ্বেতপত্র-পুষ্পের গুল্ম দেখছিস, এই হলো সেই জড়ি।

বলে গুরুদেব ছোট্ট একটা লতানে আগাছা তুলে আনলেন। ভোলানাথকে সেটা দেখিয়ে বললেন, নাম এর শঙ্কর জড়ি। এর ফলেই মহাদেব ফণীভূষণ, বাসুকি বিষ্ণুর বশ, শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন। উচ্চস্তরের সাধক ছাড়া এ মহারত্নের সন্ধান কেউ জানে না। এর স্পর্শে মুমূর্ষু সাপে-কাটা রোগী মুহূর্তে সেরে উঠে প্রাণ ফিরে পায়। এ জড়ি কাছে থাকলে কোনো ওঝারই কুচালন কু-মন্ত্র কাজে লাগে না। এ জড়ির গুণে যে কোনো বিষধরকে যেমন খুশি খেলানো যায়, যে কোনো ফণীধরকে ইচ্ছামতো কাজ করানো যায়। কেঁচো হয়ে যায় কালনাগিনী, সব সাপকেই বশে রাখা যায় এর প্রভাবে।

শুনতে শুনতে কেমন যেন তন্ময় হয়ে যাচ্ছিল ভোলানাথ। আশাভরা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল তার মুখ।

তবে একটা শর্ত আছে, বলে চললেন গুরু গোঁসাই। এ জড়ি হাতে নিয়ে কারো কোনো অমঙ্গল চিন্তা করা চলবে না। মনে কারো প্রতি কোনো ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা-বিদ্বেষ নিয়ে এ জড়ি ব্যবহার করা চলবে না। শত্রু-মিত্র জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এ জড়ি নিয়ে সকলের সেবা করতে হবে। বিপদের ডাক কারো কোনোদিন প্রত্যাখ্যান করা চলবে না। পারবি তো তুই এসব শর্ত পালন করে চলতে?

নিশ্চয়ই পারবো প্রভু। ভাবজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল ভোলানাথ।

বেশ, তবে দিলাম তোকে এ জড়ি। তোকে আর কামাক্ষা যেতে হবে না। সোজা ঘরে ফিরে যা তুই। বৌ-মেয়েকে নিয়ে আয় শ্বশুরবাড়ি থেকে। টাকা ফেরৎ দিয়ে ছাড়িয়ে নে তোর বিক্রি-করা জমিজায়গা, ঘরবাড়ি। এই জড়িই তোর সব মনস্কামনা পূর্ণ করবে। কিন্তু সাবধান, শর্ত কোনোদিন লঙ্ঘন করিস না। যেদিন তুই তা করবি সেইদিনই মৃত্যু হবে তোর।

আপনি যা বললেন তাই হবে প্রভু। বলেই ভোলানাথ মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল ভক্তিভরে।

গুরু গোঁসাই বলে উঠলেন, প্রণাম করে উঠে পিছন ফিরে আর আমার দিকে তাকাস না, সোজা চলে যা বাড়ি।

ভোলু যখন বাড়ি ফিরল তখন পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। পাখিরা সব শুরু করে দিয়েছে তাদের প্রভাতী বন্দনা। ভোলুর মনে যে আজ কি আনন্দ কাকে বলে বোঝাবে সে তা! গুরুর আশীর্বাদ পেয়েছে সে। কারো বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযোগই নেই তার।

গুরুর নির্দেশিত পথে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করল সে। দেখতে দেখতে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠল তার সংসার। নাম যশ ছড়িয়ে পড়ল সারা অঞ্চলে।

সত্যিই অদ্ভুত জড়ি। যেন মৃত সঞ্জীবনী। স্পর্শে তার প্রাণ পেয়ে উঠতে লাগল সর্পদষ্ট মৃত রোগী। কেলে খরিশের বিষে গোটা গা-টা নীল হয়ে গেছিল কালীচরণের, জড়ির গুণেই বেঁচে উঠল সে। ও পাড়ার নারান নাপিতের বৌটাকে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে কেটেছিল। ভোলুর জড়ি যেন যমের হাত থেকে জোর করে ফিরিয়ে আনল তাকে। কেউ আর পদু রায়, গুণময় গুণী, পাঁচু ওঝার কাছে যায় না। এমনকি এ অঞ্চলের ধন্বন্তরী বলা হতো যাকে, কালীপুরের করালীচরণ, তাকেও পর্যন্ত ডাকে না কেউ, ছুটে আসে সবাই ভোলানাথের কাছে। রাত নেই, দিন নেই, আহার নেই, বিশ্রাম নেই, সব সময় ডাক আর ডাক। রোগী আর রোগী। কিন্তু এতটুকু বিরক্তি নেই ভোলানাথের। ডাক পড়লেই ছোটে সে রোগীর বাড়ি।

সেবার অমনি ছুটেছিল সে বাঁকুড়া। ফটিক ডাক্তারকে সাপে কেটেছিল তার চাষবাড়ি তালঝরিয়া গ্রামে। জাত সাপের কামড়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেকে আনা হয়েছিল ভোলানাথকে। জড়ির গুণে ভোলানাথ বাঁচিয়ে তুলেছিল ডাক্তারবাবুকে। আর যায় কোথা! প্রশংসায় ভরে গেল সমস্ত বাঁকুড়া শহর। শহর ভেঙে যত ডাক্তার, যত নামকরা লোক দেখতে এল তাকে। সেকি কৌতূহল সবার! নানা জিজ্ঞাসা সবাকার মুখে। বলতেই হবে তাকে কি করে সে ভাল করল ডাক্তারবাবুকে।

ভোলানাথ হাতজোড় করে বলতে লাগল, এ সবই তার গুরুর কৃপা। তার গুরু ব্রজ গোঁসাই তাকে দিয়েই এসব করাচ্ছেন। তাই যা কিছু প্রশংসা সব তার পরম পূজ্যপাদ গুরু ব্রজ গোঁসাই-এরই প্রাপ্য।

কথাটা কানে পৌঁছল গুরু গোঁসাই-এর। তিনি তো অবাক! তিলাবেদ্যার মাখল পরবে সাপ খেলার আসরে হেরে এসে ভোলু যে ভাবে অপমান করে গেল তাঁকে সেই মুখে সে বাঁকুড়ার মতো শহরে বড় বড় লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশংসা করল কিভাবে! ছুটে এলেন তিনি ভোলানাথের ঘরে। আবেগে জড়িয়ে ধরলেন তাকে, ভোলানাথ, তুই-ই আমার আসল শিষ্য রে। সেদিন তোর কথা শুনে মনে বড় রাগ হয়েছিল আমার। মিছিমিছি অভিশাপ দিয়েছিলাম তোকে। তুই আমাকে ক্ষমা কর বাপ।

এ কি বলছেন প্রভু! জড়িয়ে ধরল ভোলানাথ গোঁসাই ঠাকুরের পা দুটো, ক্ষমা চেয়ে এভাবে অপরাধী করছেন কেন আমায়?

পা থেকে তুলে তাকে বুকে জড়িয়ে বলে উঠলেন গোঁসাই ঠাকুর, অপরাধী! আমার প্রশংসায় গোটা বাঁকুড়া জেলা ভরিয়ে দিয়েছিস তুই, আর আমি করব তোকে অপরাধী?

কেন মিছিমিছি লজ্জা দিচ্ছেন প্রভু? হাতজোড় করে মিনতি করে ভোলু। সব প্রশংসা তো আপনারই প্রাপ্য। আপনি সেদিন রাত্রে উঠিয়ে আমাকে এই মহারত্ন সর্পজড়ি দান না করলে আপনার এ অধম সন্তান কি আজ এত মানুষের আশীর্বাদ পেত? কে চিনত বলুন আপনার এ ভোলানাথকে?

কি বলছিস তুই? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্রজ গোঁসাই, কবে, কখন, কোনদিন রাত্রে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় আমি তোকে কি সর্পজড়ি দান করেছিলাম?

মৃদু হেসে উঠল ভোলানাথ, পরীক্ষা করছেন প্রভু? এই দেখুন আপনার সেই দেবদুর্লভ জড়ি, যার বলে ভোলানাথ আজ পাঁচজনের কাছে পরিচিত হচ্ছে। বলেই সে তার ঝাঁপি থেকে সেই শ্বেতগুল্ম ধরিয়ে দিল গুরু গোঁসাই-এর হাতে। প্রণাম করে বলল, আশীর্বাদ করুন প্রভু, ভুলেও কোনোদিন যেন আমি আপনার অকৃতজ্ঞ সন্তান না হই।

জড়িটা হাতে নিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন ব্রজঠাকুর। বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলে উঠলেন, আরে এ যে শঙ্কর জড়ি! কোথায় পেলি তুই এই মহাশক্তি?

আবার পরীক্ষা করছেন প্রভু? ভাবছেন আপনার ভুলো স্বভাব ভোলানাথ বুঝি ভুলে বসে আছে? বেশ চলুন আমার সঙ্গে সেই বনপুকুরের পাড়ে। সব কিছু আমার ঠিক ঠিক মনে আছে কিনা সেখানে গিয়েই আপনাকে আমি দেখিয়ে দিই।

সেই জঙ্গলের মাথায় গাছে ঝোড়ে ভরা নির্জন পুকুরটার ঈশান কোণের পাড়ে এনে হাজির করল ভোলু তার গুরুকে। আসতে আসতে সেদিনের ঘটনা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে আসছিল ভোলানাথ। শেওড়া গাছের

তলার সেই ঢিপিটা দেখিয়ে বলে উঠল সে, এই আপনার সেই স্থান, আর ঈশান কোণে ওই যে শ্বেতগুল্ম, এই হলো আপনার দেওয়া সেই শঙ্কর জড়ি। দেখলেন তো প্রভু, সব আমার ঠিক ঠিক মনে আছে কিনা?

প্রভু তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। এতক্ষণ তিনি ভোলুর সমস্ত কথা শুনে আসছিলেন। এবার ভাবগদগদ কণ্ঠে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, ভোলু, ধন্য তুই, মহা সৌভাগ্যবান তুই। সেদিন যে গুরু অন্ধকার রাতে তোকে পথ দেখিয়ে এখানে এনে এই অমূল্য সম্পদ দান করেছিলেন, আমি তোর সে গুরু নই। স্বয়ং ভগবানই তোকে আমার রূপ ধরে এভাবে কৃপা করে গেছেন!

একি বলছেন প্রভু! অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে ভোলানাথ।

ঠিকই বলছি বাবা। বললেন ব্রজ গোঁসাই। এ জড়ি আমি কেন, আমার বাবাও কোনোদিন দেখেননি। শুনেছি ঠাকুরদা নাকি এ জড়ির জন্য হন্যে হয়ে খুঁজে মরেছিলেন। সন্ধান না পেয়ে তিনি এর সমস্ত বর্ণনা দিয়ে গেছলেন বাবাকে। বাবার মুখ থেকে শোনা কথা মিলিয়ে চিনতে পারলাম এই দেবদুর্লভ মহাবস্তুটিকে। যার তার হাতে এ জড়ি আসে না বাবা। নির্দিষ্ট তিথি-নক্ষত্র ধরে শুভযোগে এ জড়ি সংগ্রহ করতে হয়। সে সব ভগবানই আমার রূপ ধরে তোকে করে দিয়েছেন। এ হলো তোর উপর তাঁর আশীর্বাদ। সে আশীর্বাদ স্মরণ করে যথানিয়মে তুই তাঁর শর্ত পূরণ করে চল বাবা। সুখী হবি তুই, ধন্য হবে তোর জীবন।

সত্যিই ধন্য ধন্য পড়ে গেল ভোলুর চারদিকে। ঈর্ষায় ফেটে পড়ল পদু রায়। গুণী ওস্তাদরা আঁটতে লাগল ফন্দি, কি করে ভোলু ওঝাকে জব্দ করা যায়। ওর বাড়-বাড়ন্ত বন্ধ না করলে তাদের পসার যে উঠে যাবে! কিন্তু জব্দ যে করবে তাকে, উপায় কি?

হঠাৎ উপায় একটা এসে হাজির হলো। অপ্রত্যাশিতভাবে ডাঙ্গারামপুরের নিমাই ঘোষের ছেলেকে কাটল সাপে। দীর্ঘদিন ধরে যে জমিটা নিয়ে ভোলানাথের সঙ্গে নিমাই ঘোষের গণ্ডগোল চলছিল, সেই জমিটার আলেই সাপের ছোবল খেল ছেলেটা। নিমাই ঘোষ ছুটল পদু রায়ের বাড়ি।

ভোলানাথের প্রাণে খুব লাগল। সাপে-কাটা রোগীর কথা কানে এলেই বিনা-ডাকে যদিও সে ছুটে যায়, আজ যেন মনের অভিমানটাই বড় হয়ে বাধা দিল তাকে। জমিটার দখলদারি নিয়ে যতই ঝগড়াঝাঁটি থাক তবুও সে যখন গ্রামের ওঝা, নিমাই ঘোষের তাকে একবার ডাকা উচিত ছিল না কি? অপমানিত বোধ করে মনের দুঃখে গ্রাম ছেড়ে সে চলে গেল গুরু গোঁসাই-এর বাড়ি। ব্রজ গোঁসাই একটা বিশেষ কাজে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাকে।

আপনি কি হারাচ্ছেন
জানেন কি?

গ্রাহকদের জন্যে
বিশেষ সুযোগ

এক বছরের
পুজো সংখ্যা সহ ১২টি সংখ্যা হাতে নিলে ১২২ টাকার বদলে মাত্র ৯০ টাকা। বুক পোস্টে ১১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ১৭০ টাকা।

দু বছরের
দুটি পুজো সংখ্যা সহ ২৪টি সংখ্যা হাতে নিলে ২৪৪ টাকার বদলে মাত্র ১৭০ টাকা। বুক পোস্টে ২১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৩৩০ টাকা।

তিন বছরের
তিনটি পুজো সংখ্যা সহ ৩৬টি সংখ্যা হাতে নিলে ৩৬৬ টাকার বদলে মাত্র ২৫০ টাকা। বুক পোস্টে ৩১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৪৯০ টাকা।

গ্রাহকদের জন্যে এই বিশেষ সুযোগ নিতে হলে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা পরিষ্কার করে লিখে নিচের ঠিকানায় এম ও করুন। চেক ও ড্রাফটেও টাকা পাঠাতে পারেন। বাংলার বাইরের ব্যাঙ্কের চেক হলে ২০ টাকা বেশি লাগবে। 'শুকতারার জন্য' কথাটি পরিষ্কার করে লিখে দেবেন।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

পরদিন দুপুরে রোদ মাথায় নিয়ে ভোলু ঘরে যখন ফিরল তখন দেখল তার বৌ আর মেয়ে মুখ গম্ভীর করে বসে আছে। উঠোনের ঈশান কোণে নিম-কুচিলা-আঁকড় গাছের তলায় বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত মা মনসার ঘট গড়িয়ে পড়ে আছে একধারে। মনসা বেদীর উপর পূজিত তার পোড়া মাটির হাতি-ঘোড়াগুলো সব এধার-ওধার ছড়ানো। গতকাল নিমাই ঘোষের সাপে-কাটা ছেলেটাকে বাঁচাতে পারেনি পদু রায়। এমনকি ওপিন্দ ওঝা, গোবিন্দ গুণী পর্যন্ত হার মেনেছে কালের কাছে। পদু রায় নাকি তার কড়ি চালা বিদ্যাও প্রয়োগ করেছিল। মন্ত্রপড়া কড়ি চারধারে ছুঁড়ে দিলে যেদিকেই সেই দংশক সাপ থাকুক, তার সেই ছোঁড়া কড়ি মাথায় নিয়ে ফিরে এসে বিষ তুলতে বাধ্য। কিন্তু তার সে বিদ্যা সফল হয়নি। পদু রায় বলেছে এটা নাকি হয়েছে একমাত্র ভোলুর কারসাজিতে। প্রতিহিংসাবশেই সে নাকি নিমাই ঘোষের ছেলেটাকে তার মন্ত্রপূত সাপে কাটা করিয়েছে তাদের গণ্ডগোলে জমির আলেই। তারপর যেই শুনেছে পদু রায়ের আসার কথা, অমনি সাপটাকে সে চালন মন্ত্রতে উড়িয়ে দিয়ে পালিয়েছে গ্রাম ছেড়ে। পদু রায় তার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এসেছিল ভোলুর মনসাথানে। সকলের সমক্ষে ভোলুর মনসা বেদীর পোড়া মাটির হাতি-ঘোড়াগুলোর তলা থেকে বের করে দেখিয়ে দিয়েছে তার সেই সিঁদুরলাগা মন্ত্রপূত ছোঁড়া কড়ি। ওপিন্দ-গোবিন্দ একজোটে পদুর এই কথাগুলোয় সায় দিতেই মাথার আর ঠিক রাখতে পারেনি নিমাই ঘোষের ভাইয়েরা। শোকের মাথায় উন্মত্ত হয়ে তছনছ করেছে ভোলুর ঠাকুরথান।

একেই তো পদুর উপর একটা জাতক্রোধ ছিল ভোলুর। তার উপর যখন বুঝল পদু নিজের অযোগ্যতা ঢাকবার জন্য কড়িচালনা বিদ্যার ভান করে তার হাতের লুকানো কড়ি পাঁচজনের চোখে ধুলো দিয়ে তার মনসাথানে বের করে তাকে বিনা দোষে দোষী করে গেছে তখন রাগে সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল তার। মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্যকে নিয়েই ছুটল সে কমলাডাঙ্গা, পদু রায়ের বাড়ি।

পদু রায়ের সঙ্গে দেখা হতেই ভোলানাথ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। শুরু হলো বাক্-বিতণ্ডা, তর্কাতর্কি। লোক জমে গেল বিস্তর। গলা ফাটিয়ে পদু যেমন বলতে লাগল, দ্রব্যগুণে একটা সাপে-কাটা রোগীকে হাতুড়ে চিকিৎসায় ভাল করে দিলেই গুণী হওয়া যায় না। বাঁকুড়ার ফটিক ডাক্তার সাপের চোটের সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতে ইনজেকশন নিয়েছিল। ফল ফলতে দেরি হওয়ায় তুই মাঝে ঢুকে বাহাদুরিটা বাগিয়ে নিয়েছিলি এই যা। সুস্থ হয়েছিল ডাক্তার নিজের চিকিৎসায়। তোর জড়ি নেওয়ার ফলে নয়। ভোলুও তেমনি বলল, কারো সম্বন্ধে মিথ্যে রটিয়ে নিজেকে কখনও বড় করা যায় না। লড়তে গেলে সামনাসামনি আসতে হয়। গুণীর পরিচয় দিতে হয় নিজের গুণে। কাকেও পিছনে লেলিয়ে দিয়ে নিজেকে বাহাদুরি বানানো যায় না। ওস্তাদ বটিস তো ওস্তাদের কাছে দাঁড়িয়ে কেরামতি দেখা।

কথাগুলো যেন জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি দিল। ভোলুকে একটা অকাট্য দিব্যি দিয়ে আসছে মনসাপুজোর মেলায় তিলাবেদ্যার সাপ খেলার আসরে তার সঙ্গে লড়তে বলল পদু। সকলের সামনে পদুর ওই চ্যালেঞ্জটা মা বিষহরির শপথ নিয়েই গ্রহণ করল ভোলু।

দেখতে দেখতে কথাটা চাউর হয়ে গেল চারদিকে। পদু-ভোলুর প্রতিযোগিতা, এ কি কম কথা! উভয়েই জাতগুণীন, নামকরা ওস্তাদ। গুরুস্থানীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না তাদের। সুতরাং তাদের লড়াই, সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার! এ লড়াই দেখবার জন্য আশপাশ সমস্ত অঞ্চলই কৌতূহল নিয়ে দিন গুনতে লাগল। কখন শ্রাবণ সংক্রান্তির মনসা পূজা হবে।

মাখল পরবের দিনটাও সেবার পড়েছিল অমাবস্যায়। অমাবস্যায় সাপের বিষদাঁতের বাড় হয়। মারণরসে তাদের বিষথলিটা পূর্ণ হয়ে ওঠে। সুড়সুড় করে তাদের দাঁতগুলো ছোবল মারবার জন্য। এ সময় যদি তারা কাকেও একবার চোট দিতে পারে তবে যত বড় গুণী হোক বা যত নামী ওস্তাদই হোক, মা বলতেও আর সময় পাবে না তারা। সেটাই চায় পদু। কারণ তুকতাক জড়িবুটি যতই জানুক ভোলু, আসরে নেমে সাপ খেলানোর চালে সে এখনও তার কাছে ছেলেমানুষ। পাকা খেলুড়ে পদু। বড় বড় আসরে পাকামাথা অনেক ওস্তাদকে সে কুপোকাৎ করেছে। নিজের গুরু ব্রজ গোঁসাইকেই সে চাঁদমারির ডাঙ্গায় ঝাপান পরবে ঘায়েল করেছিল একবার। সুতরাং মরতেই হবে ভোলুকে। মরতে হবে তার হাতের কলির দেবতা কালনাগের বিষদাঁত না-ভাঙা কাল-ছোবলে।

শঙ্কর জড়ির বলে ভোলু নির্ভয় হলেও পদুকে জব্দ করার জন্য বিষধর সাপের দরকার ছিল তার। সাপের রাজা হলো শঙ্খচূড়। খেলানো তো দূরের কথা, তার উগ্র প্রকৃতি আর ক্ষিপ্রগতির সামনে দাঁড়াবে কার সাধ্যি! এমনিই একটা সাপের চিন্তা করছিল ভোলানাথ। মনসামেলায় তখন পড়েছিল ঢাকের কাঠি। পুজোর আর বেশিদিন নেই। হঠাৎ ভোলানাথের প্রিয় শাগরেদ মহিম ঘোষাল এসে খবর দিল বনের বাঁধের পাড়ে ঝোপঝাড়ে নাকি একটা সাপ উঠেছে। সাপটা শঙ্খচূড়। মাঠের রাখাল ছেলেরা সাপটাকে দেখে পদু রায়ের দলকে খবর দেয়। শুনে পদু সাপটাকে ধরবার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছে। পায়নি এখনও।

আমাকে পেতে হবে, বলে উঠল ভোলানাথ, যেমন করেই হোক ওটাকে আমার চাই-ই মহিম।

সকালবেলায় বসে সাপটা ধরার কথাই ভাবছিল ভোলানাথ। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল মহিম, ভোলা, চল তাড়াতাড়ি।

সেই শঙ্খচূড়টা আবার উঠেছে। মোটারকম বকশিস দেব বলেছিলাম বাগাল ছেলেগুলোকে, তাই তারা গরু চরাতে গিয়ে পাড়ের উইঢিপিতে দেখেই খবর দিয়েছে আমাকে। তাড়াতাড়ি বেরো।

শঙ্কর জড়ি বাগিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরুতেই যাচ্ছিল ভোলানাথ, হঠাৎ হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়াল পদু রায়ের মেয়েটা। কাঁদতে কাঁদতে বলল তার মাকে সাপে কেটেছে। বাবার কেলে খরিশের ঝাঁপির বাঁধনটা আলগা ছিল। ঢাকনা খুলে সাপটা বেরিয়ে এসে ছোবল মেরেছে তার মায়ের পায়ে।

গুণীর স্ত্রীকে আবার সাপে কাটবে কিরে? বিদ্রূপ করে মহিম।

মেয়েটা সে কথা কানে না নিয়ে ভোলানাথকে অনুনয় করে বলতে লাগল, ভোলুকাকু, এ জাত খরিশ। তুমি ছাড়া এ অঞ্চলের আর কেউ বাঁচাতে পারবে না মাকে। চল না ভোলুকাকু তাড়াতাড়ি। মা যে খুব ছটফট করছে।

যে ভোলানাথ ডাক পেলেই ছুটে যেত আজ তার কি হলো! পদু রায়ের অপমানের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে সে কঠোরভাবে উত্তর দিল, ঘরে এত বড় গুণী বাপ থাকতে মা তোর সাপের কামড়ে ছটফট করবে কেন? সামান্য ওই কামড়টুকু সারাবার শক্তি নেই যদি তবে এত বাহাদুরি দেখাতে যায় কেন?

বাবার কি আর ঘর-বাস আছে কাকু, বলে উঠল মেয়েটা, ভোররাতে উঠে কখন যে কোন দিকে সাপ ধরতে বেরিয়ে যায় ঠিক থাকে না। শুশনিডাঙ্গা গেছে শুনে রামুকাকুকে পাঠিয়েছিলাম, দেখা পায়নি। ফিরবে যে কখন বা আজ ফিরবেও কিনা তারও কোনো ঠিক নেই তার। চল তাড়াতাড়ি ভোলুকাকু।

ধমকে উঠল মহিম ঘোষাল, ভেবেছিস কি আমরা হেংলা? খোশামোদ করতে যাব। সেদিনের অপমানটা কি ভুলে গেছে মনে করেছিস ভোলু! দূর হয়ে যা বলছি।

কি যেন ভাবছিল ভোলু। মহিম তাড়া দিয়ে উঠল তাকে, চল তাড়াতাড়ি। সাপটা গা-ঢাকা দিলে আর দেখতে পাবি? পদুই যে মেয়েটাকে ছল করে পাঠায়নি কে বলতে পারে!

পা বাড়াবে কি, কেঁদে পা দুটো জড়িয়ে ধরল মেয়েটা, মাকে আমার বাঁচিয়ে দিয়ে আসবে চল ভোলুকাকু। সত্যি বলছি, কোনো ফন্দি করে কেউ আমাকে তোমার কাছে পাঠায়নি।

ছাড় বলছি পা, ধমকে উঠল ভোলানাথ।

পথ ছাড়বে কি, নাছোড়বান্দা মেয়েটা। পা দুটো জড়িয়ে ধরে তেমনিভাবে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, তুমি ছাড়া মাকে আমার কেউ ভাল করতে পারবে না ভোলুকাকু।

পথ ছাড় বলছি। ধমকে উঠল ভোলু, যাত্রা নষ্ট করিস না।

ভয়ে মেয়েটা ছেড়ে দিল তার পা-জোড়া। ঢুকরে কাঁদতে লাগল সে মাটিতে মাথা রেখে। ভোলানাথ আর তাকাল না সেদিকে।

বনপুকুরে এসে দেখল ভোলু মহিম ঘোষের কথাটা সত্যি। উইঢিপিটার পাশে লেজে ভর করে দিব্যি ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কালফণী শঙ্খচূড়। মহিম ঘোষাল বলল, একে তোর কাছেই মনে হয় পাঠিয়েছেন মা মনসা। নইলে পদু রায়ের দল দিনের পর দিন ধন্না দিয়ে যার পাত্তাই পায়নি সে নাকি এতক্ষণ তোর জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে! এ তোর নিম-কুচিলা-আঁকড়তলের সেদিনের মা মনসার ঘট উল্টানো হাতি-ঘোড়া ছড়ানোর প্রতিশোধ। দেবী নিজে তোকে এ সাপ পাঠিয়েছেন। তাঁর আশীর্বাদরূপেই একে তুই গ্রহণ করে ঘরে নিয়ে চল ভোলু।

ভোলু সঙ্গে আনা শঙ্কর জড়িকে প্রণাম করে হাতের সাপধরা কাঠিগুলো বাগিয়ে মহিমের দিকে সাপটাকে অন্যমনস্ক করিয়ে মুহূর্তে ফণা ও লেজটা চেপে ধরল শক্ত করে। তারপর মহিমের আনা হাঁড়িটার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে মুখটা বেঁধে দিল।

জয় মা মনসা। জয় বিষহরি। আনন্দে লাফাতে লাগল মহিম। এবার পদু জব্দ হবে। যতই বড় বিষধর ধরে বেড়াক, এ সাপের কাছে বাহাদুরি দেখাতে পারবে না।

সাপের হাঁড়িটা মাথায় নিয়ে আনন্দে মা মনসার জাতগান গাইতে গাইতে ফিরল মহিম। রাখাল ছেলেরা তার সুরে সুর মেলাল।

ভোলানাথের শঙ্খচূড় ধরার খবর শুধু গ্রামেই নয়, মুহূর্তমধ্যে গ্রাম ছাড়িয়ে সমস্ত তল্লাটে রাষ্ট্র হয়ে গেল। দেখতে দেখতে গাজন মেলার মতো ভিড় জমে গেল ভোলুর উঠোনটাতে। সকলেই সাপ দেখতে চায়। নানা কথায় বুঝিয়ে ভোলু বিদেয় করল তাদের।

তুমি ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না।

দুপুর হওয়াতে স্নান করতে গেল সে।

এসে দেখে তার উঠোনে বড় অতিথি তিলাবেদ্যার তিনকড়িবাবু। নাপিতদের পুজো হলেও তিলাবেদ্যার মা মনসার আসল মালিক হলেন ইনিই। মাখল পরব, ঝাঁপান উৎসব, সাপখেলানো ইত্যাদি মেলার সমস্ত কিছু আনন্দ-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন এই বড়বাবুই। ইনিই দেন গুণীকে সম্মান, ওঝাকে পুরস্কার, ওস্তাদকে যশ-খ্যাতি। সেই মহাজন এসেছেন আজ তার দরজায়, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা?

ভোলুকে দেখেই বলে উঠলেন তিনকড়িবাবু, কাজে এসেছিলাম বাবলাডাঙ্গা। সেখানেই শুনলাম তোর বনের বাঁধের অহিরাজকে ধরার কথা। সত্যিই বাহাদুর তুই। তিন পুরুষ ধরে এ অঞ্চলের কোনো সাপুড়ে পারেনি যা, আজ তা তুই পেরেছিস। শুনেই তাই আর স্থির থাকতে পারলাম না। রাধু বোষ্টম আর গেনু গোঁসাইকে সঙ্গে করে দেখতে এলাম তোর সাপটা।

গর্বে বুকটা ফুলে উঠল ভোলুর। বলল, সেবার আপনার মেলায় সাপ খেলার আসরে বড় বেকায়দায় ফেলেছিল আমাকে পদু। উঠে আসতে হয়েছিল। আশীর্বাদ করুন এবার যেন সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারি।

এ সাপ যখন হাতে পেয়েছিস নিশ্চয়ই পারবি। বলে উঠলেন তিনকড়িবাবু।

পাশেই দাঁড়িয়েছিল মহিম, চটজলদি বলে উঠল, বাবু সব কাজ ফেলে তোর সাপ দেখবার জন্যই এই রোদ মাথায় করে ছুটে এসেছেন এখানে। সাপটা তো এখন হাঁড়ির তলায় বসে ঘুমুচ্ছে, মুখটা খুলে উপর থেকে চট করে দেখিয়ে দে না।

হ্যাঁ, ভোলু, তাড়া আছে আমার। বলে উঠলেন তিনকড়িবাবু, স্নান সেরে যখন ভিজে কাপড়ে শুদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছিস তখন চট করে খুলে দে একবার হাঁড়ির মুখটা। উপর থেকেই মা মনসাকে প্রণাম করে যাই। পরে আসরে তখন ভালভাবে দেখব তাকে।

কি যে হলো ভোলুর। অহঙ্কারের বশে ঘর থেকে শঙ্কর জড়িটা আনার কথা পর্যন্ত মনে হলো না তার। দেমাকভরে যেই খুলেছে হাঁড়ির মুখের সরাটা, অমনি নাগরাজ সজোরে মারল তার ডান হাতে ছোবল। সব বিষটুকু মুহূর্তে শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে হাঁড়ি থেকে বেরিয়ে এল ফণাধর। তিনকড়িবাবু, রাধু বোষ্টম, গেনু গোঁসাই কে কোন দিকে যে ছুটে পালাবে পথ পেল না।

ভোলুর শরীরটা যেন আগুনের হল্কায় পুড়ে যেতে লাগল। জড়ি—জড়ি, ভগবানের দেওয়া মৃতসঞ্জীবনী, কোথায় তার সেই শঙ্কর জড়ি? আছে ঘরের কোণের কুলুঙ্গিতে ঝাঁপির মধ্যে। কিন্তু কোন দিকে তার ঘর? কিছুই যে দেখতে পাচ্ছে না ভোলু। অন্ধকার! অন্ধকার ঘিরে আসছে তার চারদিকে।

চিৎকার করতে লাগল মহিম, ভোলু—ভোলু, সাপটা সামলা। কুচিলা গাছে যে উঠে যাচ্ছে সাপটা। দংশক সাপ তেঁতো গাছে উঠলে যে বিষ নামবে না। মন্ত্রবলে বন্ধ করে দে ওর গতিটা। নিজেকে সামলে নিয়ে হাঁড়িতে পোর ওটাকে। নইলে যে খেলা দেখাতে পারবি না।

হায় ভগবান! তখন কে শোনে কার কথা! এধার-ওধার হাতড়াতে হাতড়াতে টলতে টলতে বহুকষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে 'ব্রজ গোঁসাইকে খবর দে মহিম' বলেই ধপাস করে পড়ে গেল ভোলানাথ উঠোনের মাঝে। চিৎকার করে উঠল মহিম। ছুটে এল ভোলানাথের বৌ আর মেয়ে। দেখল উঠোনে পড়ে আছে ভোলানাথের দেহটা, কেঁদে উঠে আছড়ে পড়ল তারা। কান্না শুনে পাড়া-প্রতিবেশীরা ছুটে এল হন্তদন্ত হয়ে। জমে গেল ভিড়। তিনকড়িবাবুরা দাঁড়িয়ে রইলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। মহিম ছুটল ব্রজ গোঁসাই-এর কাছে।

এত যে হৈ-হট্টগোল চিৎকার কিছুই কানে গেল না ভোলুর। এদের সঙ্গে তার আর কোনো সম্বন্ধ নেই। দাঁড়িয়ে আছে সে তখন সেই শেওড়া গাছের তলায় উইঢিপিটার কাছে। সামনে লেজের ডগার উপর ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে ফণা বিস্তার করে আছে ধরে-আনা সেই শঙ্খচূড়। অহিরাজের চোখ দুটো শাসনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বাক্যহারা ভোলানাথ জড়পুত্তলির মতো অচল অসাড়। দেখতে দেখতে সেই মহানাগ বদলে গেল সেদিনের সেই ব্রজ গোঁসাই-এর মূর্তিতে। পরনে তেমনি তাঁর সাদা কাপড়, পায়ে খড়ম। মুখভর্তি সাদা গোঁফ-দাড়ি, মাথা ভর্তি পাকা চুল। বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন সেই দেবতা, কি বলেছিলাম তোকে? কি শর্ত ছিল তোর? পারলি না তুই আমার জড়ির সম্মান রক্ষা করতে? প্রতিহিংসাটাই তোর বড় হলো? পরোপকারের ব্রত ভুলে গেলি না তুই পদু রায়ের বৌকে বাঁচাতে। আমাকে নিয়ে লোকের কাছে বাহবা নিবি তুই? এত বড় সাহস! আমাকে তুই খেলাতে চাস আসরের মাঝে। মৃত্যুই তোর অহঙ্কারের একমাত্র শাস্তি।

ব্রজ গোঁসাই এলেন যখন তখন ঢলে পড়েছে বেলা। শেষ হয়ে গেছে তাঁর প্রিয় শিষ্য ভোলানাথের সকল জীবনখেলা। ব্রজ গোঁসাই তন্ত্রমন্ত্র জড়ি-বুটি নানা কাণ্ড করলেন। কিন্তু তখন এসবের নাগালের বাইরে চলে গেছে ভোলানাথ।

ছবি: ধ্রুব রায়

ফিচার

স্বদেশী মোটর গাড়ি

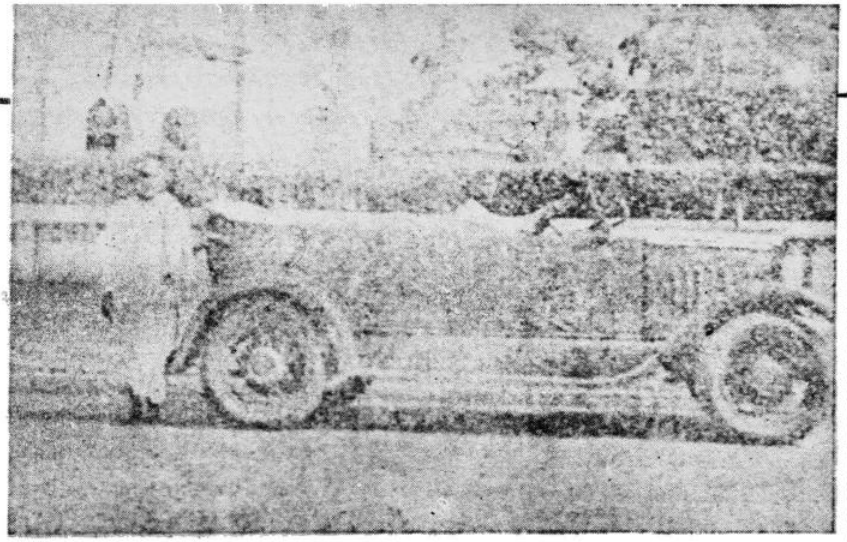

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার পথে পথে তখন চলে ঘোড়ার গাড়ি। সাহেবসুবো আর দিশি বনেদীবাবুরা চড়ে জুড়িগাড়ি। বিদ্যুতের ট্রাম তখন আসেনি। ঘোড়ায় টানা ট্রাম সরিয়ে কলকাতার রাস্তায় বিদ্যুতের ট্রাম চালানোর ব্যবস্থা হয়েছিল আরো পরে। সে বন্দোবস্ত পুরো হয়েছিল ১৯০২ সালের ১৯ নভেম্বর। কলকাতায় প্রথম মোটর গাড়ি এসেছিল ১৮৯৭ সালে। তা-ও এসেছিল মোটে তিনখানা। একখানা কিনেছিলেন জনৈক কোনো এক বসাকবাবু। বাকি দু'খানার ক্রেতা ছিল ওবার্ট ও রেনল্ডস নামে দুই সাহেব। কলকাতায় মোটর গাড়ি আসার খবর তো বললাম। তবে মোটর গাড়ি নিয়ে তার থেকেও জবর খবর হচ্ছে এই কলকাতারই বুকে বসে সে সময় একজন অখ্যাত বাঙালি মিস্ত্রি সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় এবং দক্ষতায় ইঞ্জিনসমেত তিন তিনখানা মোটর গাড়ি বানিয়ে ফেলেছিলেন। বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করে নয় ইঞ্জিনসহ সব যন্ত্রপাতি তিনি নিজেই বানিয়েছিলেন। এত বড় প্রতিভাবান মানুষটির কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। জেনে রাখা অবশ্যই দরকার।

প্রতিভাবান সেই মানুষটির নাম ছিল বিপিনবিহারী দাস। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে তাঁর ছোট্ট একখানা মোটর গ্যারেজ ছিল। একটা টিনের চালাঘরে মোটর মেরামতির কাজ হতো। ইতিমধ্যে কালকাতায় এসে হাজির হয়েছিল বেশ কিছু মোটর গাড়ি। সংখ্যায় বাড়লেও কলকাতায় তখনও ভিড় করার মতো মোটর গাড়ি এসে যায়নি। হিসেব কষে বলা যেত কোন কোন বাবুর 'হাওয়াগাড়ি' আছে। তাই মোটর সারাইয়েরও তেমন রমরমা বাজার নয়। বিপিনবিহারীর গ্যারেজও তাই ছোট্ট। ছোট্ট একটা চালাঘর।

সেই ছোট্ট চালাঘরে বসেই বিপিনবিহারী একদিন শুরু করেছিলেন তাঁর অসাধ্য সাধনের সাধনা। দিন যায় রাত নামে। নিশুতি কলকাতায় শিয়াল ডাকে প্রহরে প্রহরে। টিনের চালা চুঁইয়ে শীতের হিম পড়ে টুপটাপ। বিশ্বকর্মা বিপিনবিহারী ছমছমে রাতকে সঙ্গী করে একাকী জেগে থাকেন। চোখ থেকে ঘুম উধাও। খুটখাট ছেনি হাতুড়ি নিয়ে অন্ধকারে তাঁর নিরলস সাধনা। বুকের মধ্যে দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি প্রবল অশ্বশক্তি হয়ে উঠেছে যেন! শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁরই জয় হলো। দুঃসাহসীরা চিরকালই জেতেন। তিনিও জিতলেন। সেটা ১৯৩১ সাল। স্বদেশী হাওয়া তখন দেশ জুড়ে। কলকাতাতেও। বিপিনবিহারী দাস তাঁর বানানো প্রথম মোটর গাড়ির নাম দিয়েছিলেন 'স্বদেশী মোটর কার'। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। গাড়ি তৈরি হতে না হতেই খদ্দের জুটে গিয়েছিল। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কিনে নিয়েছিল প্রথম মোটর গাড়িখানা। আর সে গাড়ি ব্যবহারও করতেন তেমনই ডাকসাইটে দুজন মানুষ— পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আর মতিলাল নেহরু।

সাফল্য পেয়েও বিপিনবিহারী দাস কিন্তু থেমে যাননি। দ্বিতীয় গাড়ি তৈরিতে হাত দিয়েছিলেন। হাত দেওয়ার আগেই গাড়ির খদ্দের ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আসলে গাড়ির বরাত পেয়েই দ্বিতীয় গাড়ি তৈরিতে লেগে গিয়েছিলেন। গাড়ির জন্য বরাত দিয়েছিল কলকাতা কর্পোরেশন। নিন্দুকের তো অভাব ছিল না কোনোকালেই। তখনকার বাঙালি কাউন্সিলাররা বিপিনবিহারীর সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য এটাও ঠিক, কেউ কেউ তাঁকে উৎসাহও দিয়েছিলেন। ভালমানুষও তো সবকালেই থাকেন। কিছু মানুষের উৎসাহে প্রবল জেদ নিয়ে দ্বিতীয় গাড়িটির নির্মাণও সম্পূর্ণ করেছিলেন তিনি। পরীক্ষামূলক দৌড় হয়ে পাশ মার্ক পাওয়ার পর পুলিশ রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী গাড়িটির নম্বর হয়েছিল ৩৫৯৭৭। পনের অশ্বশক্তির চার সিলিণ্ডারওয়ালা সে গাড়ির স্পার্কপ্লাগ, কারবুরেটর, টায়ার আর ম্যাগনেটো ছাড়া সবকিছুই বানিয়েছিলেন নিজের হাতে। গাড়িখানার জন্য কর্পোরেশন দাম দিয়েছিল মোট তিন হাজার টাকা। তৃতীয় মোটর গাড়িটি গোয়ালিয়র রাজ্যে গিয়েছিল। জানা যায়, সেটিও দীর্ঘদিন ভালভাবেই ব্যবহার করা গিয়েছিল।

১৯৩৮ সালে মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে এই বিশ্বকর্মার মৃত্যু হয়। যে কর্পোরেশন তাঁর গাড়িটি কিনেছিল সেখানকার মিউনিসিপ্যাল গেজেটেই দায়সারাভাবে ছাপা হয়েছিল এই মানুষটির মৃত্যুসংবাদ। বিপিনবিহারীর মতো বিশ্বকর্মারা পুরস্কার তিরস্কারের ধার ধারেন না।

ভয়ঙ্করের মোকাবিলায় ম্যাম'জেল এক্স (গত সংখ্যার পর)

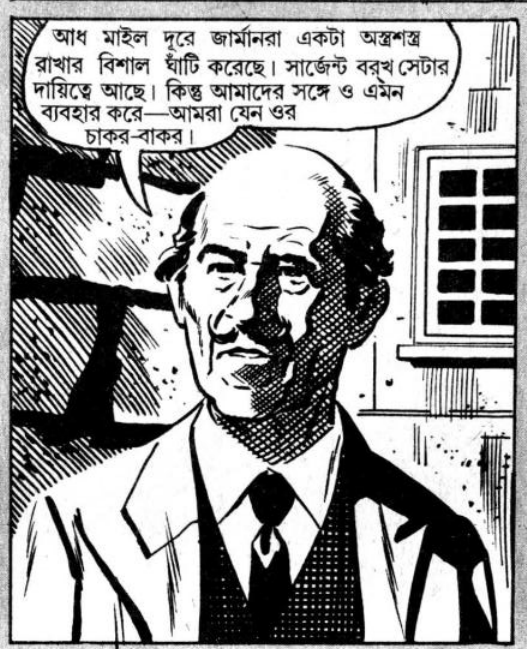

মেয়র বললেন, জার্মানদের থাকার আলাদা জায়গা থাকলেও সার্জেন্ট বরখ তাঁদের গ্রামের সব থেকে বড় বাড়িটায় একজন লর্ডের মতো আরামে থাকে। বাড়িটা যার তিনি এখন জার্মানিতে যুদ্ধ-বন্দী।

শুধু তাই নয়, গ্রামে সব থেকে ভালো যা কিছু পাওয়া যায় সব ও নিয়ে নেয়। দাম ধরতে গেলে দেয়ই না। আর সেই সব খাদ্য-সামগ্রী ও জার্মান কম্যান্ডে মোটা দামে বিক্রি করে। আমরা সব জেনেও কিছু করতে পারছি না।

কিন্তু ঐ রকম একটা গোঁয়ার-গোবিন্দকে কিভাবে ঠাণ্ডা করবে ম্যাম'জেল?
তা জানি না নিনটি। কিছু দূরে আমাদের একটা দল আছে। মনে হয় ওরা কিছু করতে পারবে। ঐ শোন!
ব্লিপ... ব্লিপ... ব্লিপ!

সার্জেন্ট বরখের আদেশ মতো তুমি গান গাইবে ম্যাম'জেল। আমি ভাবতেও পারিনি তুমি রাজী হবে। ভেবেছিলাম, তুমি অনেক বেশি সাহসী।
বিদায় মঁসিয়ে। নিনটি এসো, আমরা আমাদের কটেজে যাই।

গাঁয়ের ঠিক বাইরে সেই কটেজটা...
মনে হচ্ছে আমরা ঠিক সময়েই এসেছি। এই গ্রামের দরিদ্র মানুষদের সাহায্য করতে পারবো বোধহয়।

রেডিও। সর্বনাশ! সুইচ অন করা ছিলো! ছোট হিটলারের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখন ভাগ্যিস এটা ব্লিপ ব্লিপ করতে শুরু করেনি। বাইরে লক্ষ্য রেখো নিনটি!
ব্লিপ! ব্লিপ!

ম্যাম'জেল তার সেলাই-এর সুতোর বাক্সটা খুলে গোপন যন্ত্রটা বের করে নিলো।
ম্যাক্স কলিং... ম্যাক্স কলিং... কাম ইন পি কিউ!

(চলবে)

অরণ্যপতি টারজান

সব্যসাচী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

টারজান একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে সমরনায়ক নর্থহ্যামটনকে। কমপক্ষে তিন, বেশির পক্ষে পাঁচ দিনের মধ্যে সে অসাধ্য সাধন করবে একটা। করবে সেই সমরনায়কেরই উপকারার্থে। যে পরিখা থেকে সমগ্র ব্রিটিশ সেনার সমবেত প্রয়াস স্থানচ্যুত করতে পারেনি জার্মান দখলদারবর্গকে, সেখান থেকে তাদের ঝাড়ে-মূলে উৎখাত করবে টারজান, তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে। প্রতিজ্ঞা করে এসেছে বটে, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের উপায় কি মাথায় এনেছে কিছু?

হঠাৎ যেন টারজানের মস্তিষ্কে বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে গেল একটা। সেই সিংহ! কয়েকদিন উপবাসী থাকার পরে সে খাদ্য পেয়েছিল টারজানের হাত থেকেই। তার জন্য কি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতাও তার প্রতি অনুভব করবে না পশুরাজ? আশৈশব জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে টারজানের। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুব ভাল রকমই জানা আছে তার।

পশুরাজ ন্যুমার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে খাদ্যদাতার সে বড় বাধ্য। সেক্ষেত্রে সেই সিংহটার তো বিশেষ রকমই আনুগত্য থাকবার কথা টারজানের কাছে! একটা পরীক্ষা করলে হয়। সফল যদি হয় সে পরীক্ষা, ওকে দিয়েই এবারও হয়তো কার্যোদ্ধার হবে টারজানের। ঠিক কীভাবে কী হবে, এখনও অবশ্য তা মাথায় আনতে পারেনি টারজান। যথাকালে ভেবে দেখবে তা।

এখন সমস্যা হলো, সেই বিশেষ ন্যুমাটিকে পাওয়া যাবে কোথায়? টারজান যতদূর জানে, সেই সুড়ঙ্গওয়ালা উপত্যকাই ছিল ওর আদি বাসভূমি। সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করে দিয়েই ওকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিল টারজান। সেই আদি বাসস্থানে কি ফিরে যায়নি ন্যুমা? একবার সেখানে গিয়ে দেখা উচিত।

বিরাট মহাদেশ এই আফ্রিকা। এর এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শুধু কষ্টসাধ্য নয়, যারা দেহে মনে অত্যন্ত মজবুত মানুষ নয়, তাদের পক্ষে এটা অসম্ভবই। টারজানের পক্ষে এটা সম্ভব হতে পারে, কারণ দেহ এবং মন, দুইয়ের দিক থেকেই সে অত্যন্ত দৃঢ়। তার উপরেও তার মস্ত সুবিধা আছে একটা, অরণ্যসঙ্কুল অঞ্চলে সে শূন্যপথে ভ্রমণ করতে পারে, যে কাজ সে ছাড়া অন্য যে কোনো দেহধারী মানুষের কাছে স্বপ্নেরও অগোচর ব্যাপার।

তাই হলো। বৃক্ষচূড়ায় বৃক্ষচূড়ায় লাফাতে লাফাতে দ্বিতীয় দিনেই সেই সুড়ঙ্গের কাছাকাছি এসে হাজির হলো টারজান। উর্বর প্রদেশটা পেরিয়ে পাথুরে অঞ্চলে প্রবেশ করার আগে একবার গাছ থেকে নামতে হলো টারজানকে। ন্যুমা মহারাজের জন্য কিছু ভেট তো

এখান থেকেই যোগাড় করে নেওয়া দরকার। পাথুরে অঞ্চলে ঢুকে পড়লে তো আর হরিণ মিলবে না!

অরণ্যসীমায় এসেই এক পাল বৃহদাকার হরিণের সাক্ষাৎ পেলো টারজান। রাইফেল থাকলে এক মিনিটেই তার একটাকে ঘায়েল করতে পারত টারজান। কিন্তু তার সম্বল তো তীরধনুক আর ছোরা। তীর মেরে আহত করা যায় জানোয়ারকে, কিন্তু সরাসরি হত্যা করা প্রায় অসম্ভব। কাজেই তীরের সাহায্যে হরিণ শিকার যারা করতে চায়, তারা তাক করে জন্তুটার একখানা পা। তার ফলে আহত জন্তুটার গতিবেগ যায় অনেক কমে। তখন বহুক্ষণ পশ্চাদ্ধাবনের ফলে তাকে ধরা সম্ভব হতে পারে।

টারজানের পক্ষে এই পশ্চাদ্ধাবনের কাজটা সংক্ষেপ হয়ে এসেছে, তার কাঁধের ঐ ঘাসের দড়িগাছার জন্য। প্রথমে অবশ্য তীরই হাঁকালো সে, জখম হলো হরিণটার পিছনের ডান পা। একবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুই মিনিটের মধ্যেই সে উঠে দাঁড়াল আবার। পালের অন্য প্রাণীরা ততক্ষণে বনান্তরালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। টারজান অনুসরণ করল। জখম পা নিয়েও কি কম বেগে দৌড়োচ্ছে শিকার?

যা হোক, সে বেগ আপনা থেকেই কমে এলো। আর কমে এলো খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই। টারজান পিছনেই আছে। সে হিসাব করে দেখল, জীবটা তার দড়ির পাল্লার মধ্যে এসে গিয়েছে। এইবার সে দড়িটা ছুঁড়ে দিল।

মৃত হরিণ পিঠে নিয়ে হৃষ্টচিত্তে পথ চলা শুরু করল টারজান আবার। বেলা দ্বিপ্রহরে সেই সুড়ঙ্গ মুখ। এলোমেলো চাঙড়গুলো দ্বারপথেই ছড়িয়ে পড়ে আছে ইতস্ততঃ। কোনোটার উপরে পা রেখে, কোনোটাকে লাফিয়ে ডিঙিয়ে সুড়ঙ্গের ভিতরে অদৃশ্য হলো টারজান।

গোটা সুড়ঙ্গটা দৈর্ঘ্যে সিকি মাইলের মতো। তার প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত নির্বিরোধে চলে এল টারজান। পিছনে কোনো বৃহৎ জানোয়ারের চাপা পায়ের শব্দ শোনা যায় না কি? না, মনের ভুল ওটা টারজানের। কেউ তার পিছু নেয়নি।

অবশেষে আলো দেখতে পেল টারজান। মাঠের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে পশ্চিমের গিরিগাত্র পর্যন্ত রোদে রোদে ঝলমল করছে। আর সেই রোদে আপাদমস্তক স্নান করছে এক পিঙ্গলজটী পশুরাজ। উপত্যকার একটি বৃক্ষের পায়ের কাছে।

টারজানকে সে দেখেছে। প্রথমেই একটা অনুচ্চ তর্জন। পরিচয় চাইছে ন্যুমা। তার উত্তরে অবিকল সিংহ ভাষাতেই জবাব দিচ্ছে টারজান—"আমাকে ভুলে গিয়েছ বন্ধু? সেই যে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম দূর দেশের এক গভীর গর্তের মধ্যে। এদেশে তখন মাংস পাওয়া যাচ্ছিল না! মনে নেই?"

ন্যুমার গলায় ঘড়ঘড় আওয়াজ। ও বলছে—"ঠিক! এখানে

বৃক্ষচূড়ায় বৃক্ষচূড়ায় লাফাতে লাফাতে....

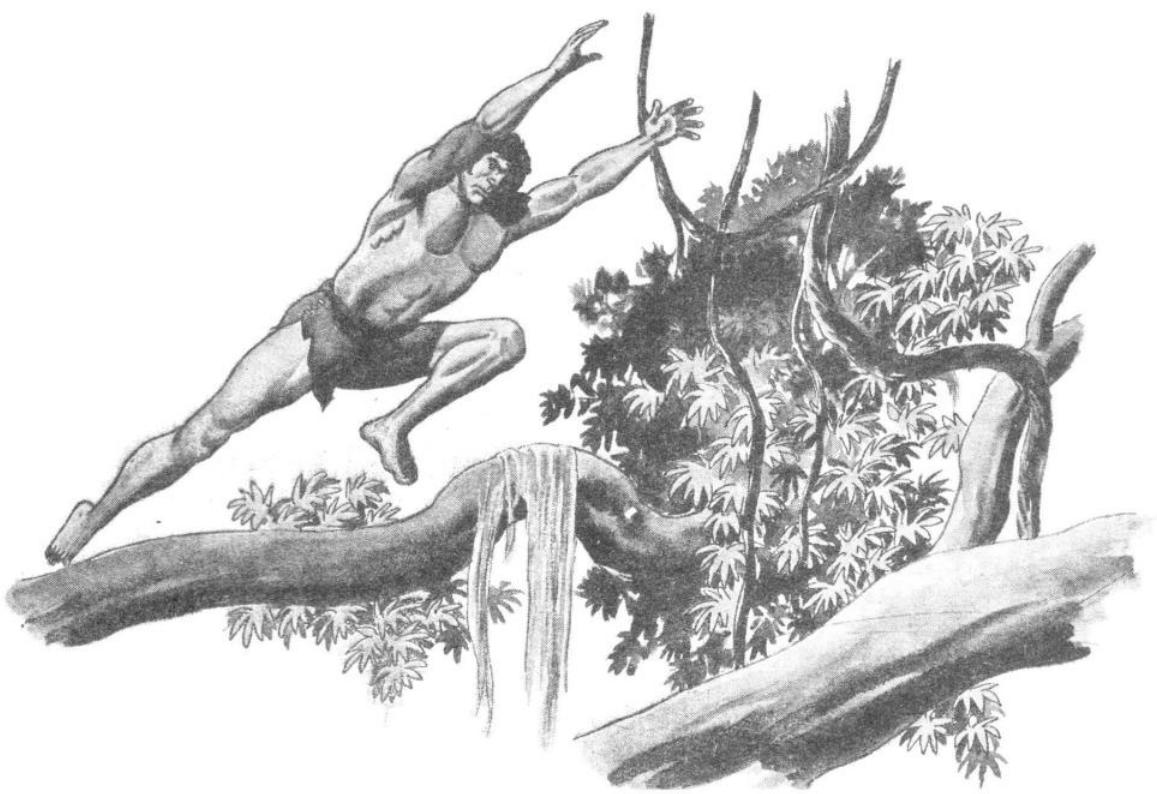

তখন পাওয়া যাচ্ছিল না। তুমি আমায় নিয়ে গেলে। তা, আজও কী যেন এনেছ দেখছি?"

"তা তো এনেইছি? বন্ধুর কাছে আসা, শুধু হাতে কি আসতে আছে? চল, ঐ গাছতলাতেই চল। দেখ, কী এনেছি। আমি এর ভাগ চাই না! একা তুমিই খাবে এই এতবড় হরিণটা।"

বাঁ কাঁধের হরিণটাকে এইবার ডান কাঁধে স্থাপন করল টারজান। মনের ইচ্ছেটা এই যে ন্যুমা ভাল করে দেখুক হরিণটা কত বড় আর কেমন মোটাসোটা।

"তা বলে এক্ষুণি লাফ মেরো না বন্ধু! তাতে আমার কাঁধে গলাতেও তোমার থাবার ঘা লেগে যেতে পারে। আর তা যদি লাগে আমি তো গেছি। তোমার থাবা হজম করেও বেঁচে থাকবে এমন জীব এই মহাদেশের জঙ্গলে কয়টা আছে, আমায় কেউ দেখিয়ে দিক না!"

মিষ্টি মিষ্টি কথা, আর সঙ্গে সঙ্গে অত বড় হরিণটা গোটাই একা একা খেতে পাওয়ার ললচানি। বনের পশু ন্যুমা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। তার মাথায় এই একটা কথাই ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে লাগল যে এই লম্বা-চওড়া টারমাঙ্গানিটার মতো সুহৃদ তার অন্য কেউ নেই দুনিয়ায়।

টারজান ক্রমে ন্যুমাকে সেই নাম-না-জানা সুপয়া গাছটার তলায় নিয়ে এল। হরিণটাকে রেখে দিল গাছতলায়, আর নিজে উঠে বসল গাছের নিম্নতম ডালটাতে। সেখানে বসে গালগল্প চালাতে লাগল ন্যুমার সঙ্গে। ঐখানটাতে বসাই তার কাছে নিরাপদ মনে হয়েছে। বলা যায় কী ন্যুমার কথা? বনের জীব, কখন কী খেয়াল হয়, ঠিকানা কী? এই তার মেজাজ রয়েছে একদম শরিফ। এই আবার আগুন জ্বলে উঠতে পারে সেই মাথায়। তখন আর পাঁচ মিনিট আগের বন্ধুকে তার চিবিয়ে খেতে বাধবে না। তেমন তেমন হলে গাছ বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে যেতে পারবে টারজান চোখের পলকে।

"জানো বন্ধু"—জপাচ্ছে ন্যুমাকে টারজান—"এই যে জায়গাটায় তুমি আমি বাস করছি, এ একটা হতচ্ছাড়া জায়গা। একটা হরিণ যোগাড় করতে পুরো একটা দিন কেটে যাবে তোমার আমার। তার চেয়ে চল, এক কাজ করা যাক। একদিনের পথ যদি একটু জোর পায়ে চলে যাও আমার সঙ্গে, এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে, যেখানে হাজারে হাজারে মানুষ আর জানোয়ার গিজগিজ করছে মাঠে জঙ্গলে পাহাড়ের গায়ে। ধর আর খাও। হাতিয়ার আছে তাদের অবিশ্যি, কিন্তু তাতে কি আর তুমি ডরাবে? তোমার একটা হাঁক শুনলেই তারা দুদ্দুড় করে দৌড়বে, যে যেদিকে পারে।"

হরিণের অত বড় ধড়টা ন্যুমা ইতিমধ্যেই প্রায় হাড্ডিসার করে এনেছে। খেতে খেতে শুনেছে সে টারজানের প্রস্তাব। এত বড় প্রলোভন উপেক্ষা করা তার পক্ষে কি কখনো সম্ভব? হাজারে হাজারে মানুষ আর জন্তু নাকি মাঠে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্রেফ ন্যুমা মহারাজদের অবসরের অপেক্ষায়। মনোরম আশ্বাস নয়?

যতক্ষণ হরিণের এক কুচি হাড়ও অবশিষ্ট রইল, ফুসফুস গুজগুজ চলল দুই বন্ধুতে। গাছের ডালে টারজান, গাছের তলায় ন্যুমা। মন্ত্রণা যখন শেষ হলো, টারজান নেমে এল গাছ থেকে, ন্যুমা পরিত্যাগ করল হরিণের কঙ্কালটা, দুইজনে পাশাপাশি যাত্রা করল সুড়ঙ্গ মুখে। আগে পিছে নয়। ন্যুমাকে আগে দেওয়া বৃথা, সে পথ চেনে না, আবার টারজানও নরখাদক সিংহকে পিছনে নিয়ে এক পাও হাঁটতে চায় না, কী জানি কখন মেজাজ বিগড়ে যাবে চারপেয়ে রাজার।

পরদিন সন্ধ্যায় ন্যুমাকে নিয়ে টারজান উপস্থিত হলো জেনারেল নর্থহ্যামটনের ছাউনির সান্নিধ্যে। কড়ার ছিল তিন থেকে পাঁচ দিনের। আজ চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় সে এসেছে ফিরে। ইংরেজ শিবির ঘিরে সেদিন পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র অবরোধ ছিল জার্মান বাহিনীর। তখন ইংরেজ সৈন্যের নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল কোল্ডব্রিজ। এমন দুর্দশায় তিনি পড়েছিলেন, লন্ডনে বসে যুদ্ধদপ্তর প্রতি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করছিল, কখন বুঝি কোল্ডব্রিজের আত্মসমর্পণের খবরই আসে। কিন্তু সে লজ্জাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার আগেই একটা কামানের গোলায় নিহত হলেন কোল্ডব্রিজ। নর্থহ্যামটন ছিলেন তাঁর নিচের পদের সেনাধিনায়ক, যথারীতি প্রমোশন পেয়ে তিনি উঠে গেলেন স্থানীয় প্রধান সেনাপতির পদে। এবং যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিলেন এক হপ্তার ভিতরেই।

জার্মান অবরোধকারীরা তখন পরিখায় পরিখায় ঘিরে ফেলেছে ইংরেজ শিবির। এত নিকটে তারা এসে পড়েছে যে পরিখার ভিতর থেকে ঢিল ছুঁড়লে তা নর্থহ্যামটনের অফিস-টেবিলের উপরে এসে পড়ে। নর্থহ্যামটনের এখন আপ্রাণ চেষ্টা দাঁড়ালো, এই পরিখাগুলি থেকে শত্রুকে তাড়াতে হবে। অনেকটা সফলও হয়েছিলেন সেই চেষ্টায়। একটা ছাড়া অন্য সব পরিখাই তিনি শত্রুকবলমুক্ত করতে পেরেছেন দেড় মাসের ভিতরে। কেবল একটা পরিখা নিয়েই তিনি পড়েছেন মুশকিলে। সেটা থেকে জার্মানদের তাড়াতে পারা যাচ্ছে না কোনোমতেই। এঁদের সন্দেহ যে পরিখার তলায় কূপ বা সুড়ঙ্গ তৈরি করে নিয়েছে শত্রুরা। গোলাবৃষ্টির সময় তারই ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এই দুরতিক্রম্য পরিস্থিতির কথাই সেদিন টারজানকে বলেছিলেন নর্থহ্যামটন। টারজান হেসেছিল সব শুনে। ভরসা দিয়েছিল, সে পারবে ঐ অসাধ্য সাধন করতে। ঐ দুরধিগম্য পরিখাকে জার্মানমুক্ত করতে। তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে। আজ সেই সময়সীমার চতুর্থ দিন।

(চলবে)

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ

নন্দলাল

গার্গী গঙ্গোপাধ্যায়

আমার বয়স যখন বছর এগার, তখন একবার কাশী গিয়েছিলুম।

বেনারস ক্যান্টনমেন্টের কাছে আমাদের একটা বাড়ি ছিল। কোনো চেঞ্জার ওখানে বেড়াতে গেলে মাঝে মাঝে ভাড়া নিতো। বেশির ভাগ সময় খালিই থাকতো। একজন লোক ছিলো, বাড়িটার দেখাশোনা করতো। যদি কেউ ভাড়া নিতো তাহলে মনি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতো।

কলকাতায় থেকে ঠিকমতো দেখাশোনা করা যায় না বলে ঠিক করা হলো বাড়িটা বিক্রী করে দেওয়া হবে। এ সম্বন্ধে ওখানে চিঠি লেখালেখিও চলছিল।

পুজোর পর ঠিক হলো দাদু কাশীতে যাবেন বাড়িটা বিক্রী করার জন্যে। আমি বায়না ধরলুম আমিও যাবো।

আমাদের পরিবারের বহু পুরোনো পাণ্ডা ছিলেন যিনি তাঁর এক বিধবা মেয়ে থাকতেন কাশীর গণেশ মহল্লায়। ঠিক হলো তাঁর ওখানেই ওঠা হবে। ওঁরা উত্তরপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ। তিনি মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন আর আমাদের বাড়িতেই উঠতেন। আমরা তাঁকে পান্নাদিদি বলতুম।

যাই হোক, আমরা কাশী পৌঁছে পান্নাদিদির কাছেই উঠলুম। একটা বিশাল বাড়ির দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে পান্নাদিদি থাকতেন। সেখানে আরও অনেক ঘর ভাড়াটে ছিল।

ধর্মশালায় না উঠে পান্নাদিদির কাছে ওঠাতে এই সুবিধে হয়েছিল যে দাদু যখন কাজেকর্মে বেরোতেন তখন আমাকে একলা রেখে যাওয়ার দুশ্চিন্তা ছিল না। আমি পান্নাদিদির কাছে থাকতুম। উনি হিন্দি মেশানো বাংলায় আমার সঙ্গে অনেক গল্প করতেন। অনেক ভজন গান শোনাতেন। খুব যত্ন করতেন আর ভালো ভালো রান্না করে খাওয়াতেন। যদিও সবই নিরামিষ।

দাদুর যেদিন বাড়ি বিক্রী সংক্রান্ত কাজ থাকতো না সেদিন দাদুর সঙ্গে বেরোতুম। গোধূলিয়ার মোড় থেকে টাঙা ভাড়া করে এদিক ওদিক যেতুম। কখনো দশাশ্বমেধ ঘাট, কখনো বিশ্বেশ্বরের মন্দির। মণিকর্ণিকার ঘাট দেখে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ওটা ওখানকার শ্মশান। কাশীতে রাস্তায় ঘাটে পাথরের নানারকম মূর্তি চোখে পড়ে। দাদু আঁকতেনও ভালো। যখনই বেরোতেন, স্কেচ করার খাতা আর পেন্সিল নিয়ে বেরোতেন। মাঝে মাঝে টাঙা থামিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এটা সেটা এঁকে নিতেন। রাস্তার লোকেরা তখন অবাক হয়ে দাদুর দিকে আর আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো।

আমরা বেরোতুম আর দোকান থেকে এটা সেটা খেয়ে বাড়ি ফিরতুম। একদিন টাঙা করে ফেরার সময় দাদু বললেন—চলো দিদি, মালাই খাওয়া যাক। এখানকার মালাই বিখ্যাত।

আমরা টাঙা থেকে নেমে একটা গলির মধ্যে মালাইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মালাই খাচ্ছি, এমন সময় টাঙাওলাটা একটা ছোট বালতি হাতে মালাইওলার কাছে একটু জল চাইলো। বললে—ঘোড়াটা হয়রান হয়ে গেছে, ওকে একটু দানাপানি দেবো।

আমার হঠাৎ মনে হলো, আমরা খাচ্ছি, ঘোড়াটাও খাচ্ছে কিন্তু বেচারা টাঙাওলাটা শুকনো মুখে খাওয়াচ্ছে তার ঘোড়াকে। আমি দাদুর কাছে বায়না ধরলুম ওকেও কিছু খাওয়াতে হবে। দাদু বললেন—ঠিক কথা, ও-ই বা বাদ যাবে কেন?

ওকে ডেকে দাদু কচুরি, তরকারি আর মালাই কিনে দিলেন।

টাঙাওলাটা বেশ জোয়ান ছেলে। কলকাতায় এই বয়সের ছেলেরা কলেজে পড়ে। ওর গায়ে লাল-কালো ছাপা একটা কুর্তা। পরিতৃপ্তি সহকারে খাবার খেয়ে দোকান থেকে এক ঘটি জল চেয়ে খেলো। তারপর দাদুকে বললে—বাবুজি, আমার খুব ভুখ লেগেছিল। তুমি খেতে দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচালে।

ওর সঙ্গে আমাদের বেশ আলাপ হয়ে গেল। ওর নাম নন্দলাল। ও বাঙালীটোলার কাছে থাকে। ওর বাবা-মা নেই। কাকার কাছে থাকে। টাঙাটা ওর কাকার। রোজ ও টাঙাটা নিয়ে বেরোয়। যা রোজগার হয় সব কাকাকে দিয়ে দিতে হয়। বিনিময়ে কাকা থাকতে দেয় আর রাত্তিরে পেটভরে খেতে দেয়। সকালে ও দুটো বাসি চাপাটি আর একটু গুড় ছাড়া আর কিছু পায় না।

আমি বললুম—তুমি রাস্তায় কিছু কিনে খেয়ে নাও না কেন? ওরা তো আর জানতে পারছে না তুমি কতো রোজগার করছো?

ও প্রকাণ্ড একটা জিভ কেটে বললে—বাপ রে, ঐ বেইমানি আমি কাকার সঙ্গে করতে পারবো না। তাহলে তো দুনিয়ায় কোনোদিন কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে না!

ওর একটাই উচ্চাশা ছিল—যদি কোনোদিন নিজে একটা টাঙা কিনতে পারে।

যাই হোক আমাদের সঙ্গে কথাই হয়ে গেল যে এর পর থেকে আমরা যেখানেই যাবো নন্দলাল আমাদের নিয়ে যাবে।

তাই হলো কদিন। আমরা বেরিয়ে গোধূলিয়ার মোড়ে যাই। দূর থেকে লাল-কালো ছাপা সেই মার্কামারা জামা দেখেই নন্দলালকে চিনতে পারি। তারপর ওর টাঙায় চেপে এদিক ওদিক ঘুরে আসি।

দাদুর সঙ্গে ওর খুব ভাব। ইতিমধ্যে দাদু ওকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন কথা দিয়ে ফেলেছেন। আর কেন জানি না আমার এতে বেশ আনন্দই হয়েছে।

এর মাঝে একদিন আমাদের বাড়িটা বিক্রী হয়ে গেল। পান্নাদিদির ভয় ছিলো। দাদুকে বললেন—ভাইয়া, তুমি অতো টাকা নিয়ে একলা অতো দূর থেকে আসবে?

দাদু বললেন—নন্দলাল আমার সঙ্গে থাকবে। কোনো চিন্তা নেই।

বাড়ি বিক্রীর টাকা থেকে দাদু নন্দলালকে হাজার টাকা দিলেন। ওর নতুন টাঙা কেনা হবে। কথা রইলো ও প্রত্যেক মাসে মনি-অর্ডার করে দাদুকে কলকাতার বাড়িতে কিছু কিছু করে পাঠিয়ে টাকাটা শোধ করে দেবে। ওর ইচ্ছে—যখন সব শোধ হয়ে যাবে তখন ও একবার কলকাতা বেড়াতে আসবে। আমাদের বাড়িতে উঠবে। দাদু ওকে ঘুরে ঘুরে সব দেখাবেন।

একদিন ঠিক হলো আমরা মিশারপোখর যাবো। ওখানে আমার এক পিসিমার বাড়ি। নন্দলালকে বলা রইলো ও বেলা দশটা নাগাদ গণেশ মহল্লায় আমাদের বাড়ির গলির মুখে নিতে আসবে।

সকালবেলায় তৈরি হয়ে বসেই আছি, নন্দলালের দেখা নেই। শেষে আমরা হাঁটতে হাঁটতে গোধূলিয়ার মোড়ে চলে গেলুম। সেখানেও নেই।

দাদুকে খুব চিন্তিত বলে মনে হলো। বললেন—টাকা নিয়ে ছেলেটা ভাগলো নাকি?

পিসিমার বাড়ি আর যাওয়া হলো না। সন্ধ্যেবেলায় দাদু আমাকে সঙ্গে নিয়েই একটা টাঙা করে বাঙালীটোলার দিকে গেলেন নন্দলালের খোঁজে।

যে রকম জায়গায় ওর ডেরা বলেছিল সেখানে এদিক ওদিক করতেই পাওয়া গেল ওদের ঘর। ময়লা জামাকাপড় পরা আধা বৃদ্ধ একজন লোক হাউ হাউ করে কাঁদছে। একজন আধাবয়সী মহিলা মুখটা শক্ত করে বসে আছে। আর কয়েকজন প্রতিবেশী পুরুষ যে লোকটি কাঁদছে তাকে ঘিরে আছে।

দাদু জিজ্ঞেস করতে প্রতিবেশীদের একজন জানালো—গতকাল দুপুরে নন্দলালের টাঙার ঘোড়াটা কিভাবে যেন ক্ষেপে গিয়ে দৌড়ে কোন একটা মন্দিরের থামের সঙ্গে ধাক্কা লাগায়। নন্দলাল টাঙা থেকে ছিটকে পড়ে। ওর মাথায় দারুণ চোট লাগে। অত্যধিক রক্তপাতের ফলে ওর মৃত্যু হয়। এইমাত্র ওর সৎকার করে সব ফিরেছে। ওর কাকা পাগলের মতো কাঁদছে।

আমরা ফিরে এলুম গণেশ মহল্লায়। নন্দলালের মৃত্যুতে দাদু খুব মর্মাহত হয়েছেন বুঝতে পারলুম। কারণ সারা রাস্তা দাদু একটাও কথা বললেন না। আমার চোখে খালি ভাসছিল লাল-কালো ছাপের কুর্তা পরা নন্দলালের হাসিভরা মুখটা।

বাড়ি ফিরতেই পান্নাদিদি বললেন—নন্দলাল এসেছিল। এক্ষুণি গেল, দেখা হলো নাকি?

দাদু আর আমি দুজনেই চমকে উঠেছি।

তার মানে? দাদুর মুখ থেকে কথাটা আপনিই বেরিয়ে এল।

পান্নাদিদি বললেন—মানে আবার কি? ওর মাথায় একটা বড়ো ব্যান্ডেজ বাঁধা। ও নাকি পড়ে গিয়েছিল টাঙা থেকে। এই প্যাকেটটা দিয়ে গেছে।

দাদুর হাতে পান্নাদিদি একটা প্যাকেট দিলেন। মায়ের জন্যে শাড়ি কেনা হয়েছিল, তার প্যাকেটে মুড়ে দাদু ওকে টাকাটা দিয়েছিলেন। সেই প্যাকেট। কাঁপা কাঁপা হাতে দাদু খুললেন। বেরোলো অক্ষত হাজার টাকা। নন্দলাল বেইমানি করেনি।

ছবি: সুফি

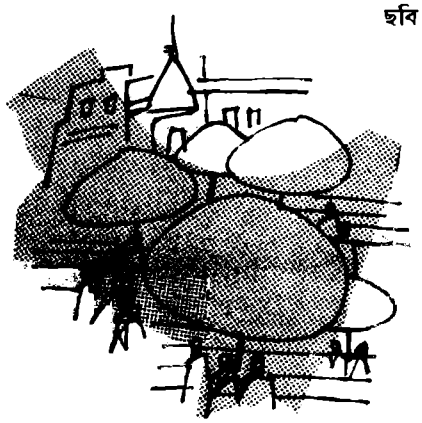

ডাইনীরা বড় নিষ্ঠুর

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক কাল আগে এক দেশে এক বুড়ো-বুড়ি বাস করতো। তাদের ছিল একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। মেয়েটি বড় আর ছেলেটি ছোট। ফুটফুটে চাঁদের মতো মেয়েটি আর টুকটুকে ফুলের মতো ছেলেটি শুধু খেলতো আর খেলতো। সারাটা দিন তারা খেলেই কাটাতো। আর কেউ তাদের সঙ্গী-সাথী ছিল না। বড় আনন্দে কাটাতো দুটি ভাই বোন।

কিছুদিন পরে বুড়ো-বুড়ি মারা গেলে ওদের আপনজন বলতে আর কেউ রইলো না। ঘরে তাদের আর মন বসে না। একদিন মেয়েটি তার ভাইকে বলে, চল ভাই, আমরা কোথাও চলে যাই।

ভাই বললো, কোথায় যাবি দিদি?

অনেক দূরে, দিদি বলে, কোথাও কোনো কাজকর্ম পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে হবে।

কাজ?

হ্যাঁ ভাই।

আমরা কাজ করবো? ছেলেটি বলে, আমরা আর খেলা করবো না?

দিদি সস্নেহে ভায়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, নিশ্চয়ই খেলা করবো ভাই। কিন্তু আমরা এখন তো একটু একটু করে বড় হচ্ছি, তাই খেলার সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু কাজও করতে হবে বৈকি!

একদিন খুব ভোরে দুটি ভাই বোন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।

অনেক পথ হাঁটতে হাঁটতে তারা অনেকদূরে চলে এলো।

বেলা বাড়লো। এক সময় ছেলেটির খুব জলপিপাসা পেলো। সে বললো, দিদি রে? একটু জল খাবো।

জল? দিদি বললো, আর একটু এগিয়ে চল। কোথাও একটা কুয়ো পেয়ে যাব।

কুয়ো?

হ্যাঁ ভাই, কুয়োর জল কত ঠাণ্ডা।

আবার হাঁটতে লাগলো তারা। কিন্তু কোথায় কুয়ো?

মেয়েটি কিন্তু কেমন করে যেন বুঝতে পারে যে, একটা ডাইনী অদৃশ্য থেকে তাদের পিছু নিয়েছে। সব সময় সে তাদের

ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না। মেয়েটি খুব সতর্কভাবে পথ চলে।

আরো বেলা বাড়লো। সূর্য উঠলো মাথার উপর। প্রচণ্ড গরমে ছেলেটির পিপাসা আরো বেড়ে গেলো। বললো, দিদি। আর পারছি নে। একটু জল।

হঠাৎ তারা দেখলো, মেঠো পথে গরুর খুরের চাপে ছোট্ট একটা গর্ত হয়ে গেছে আর তাতেই একটু জল চিক্‌চিক্ করছে। ছেলেটি বললো, এই জলটুকু খাব দিদি?

দিদি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, না রে না, ঐ জল খেলে তুই বাছুর হয়ে যাবি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

আর একটু পথ হাঁটতেই তারা ঘোড়ার খুরের চাপে তৈরি একটা গর্ত দেখতে পেলো। তাতেও একটু জল রয়েছে। ছেলেটি সেই জলটুকু খেতে চাইল। দিদি বাধা দিয়ে বলে, এই জল খেলে তুই একটা বাচ্চা ঘোড়া হয়ে যাবি।

আবার তারা পথ হাঁটতে লাগলো। এবারে তারা দেখলো একটা ছাগলের খুরে তৈরি গর্তে জল।

দিদি! ছেলেটি বললো, আর পারছি নে। এই জলটুকু খেয়ে নিই।

না ভাই, দিদি বলে, এ জলটুকুও তুই খাস না ভাই। এ জলটুকু খেলে তুই একটা ছাগলছানা হয়ে যাবি। তার চেয়ে আর একটু এগিয়ে চল দেখি.....

ছেলেটি কিন্তু এবার আর দিদির কথা শুনলো না। দিদি যেই পিছন ফিরেছে অমনি সে এক আঁজলা জল মুখে দিল। তেষ্টা তার মিটলো বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে একটা ছাগলছানা হয়ে গেল। দিদি বলে ডাকতে গিয়ে পারলো না। ছাগলের মতো ডাকতে লাগলো সে।

এদিকে মেয়েটি তার ভাইকে আর খুঁজে পায় না। এখানে ওখানে দেখে আর ভাবে ভাই গেল কোথায়? হঠাৎ একটা ছাগলছানা তার কাছে এগিয়ে এল। তাকে দেখে দিদির বুঝতে আর বাকি রইলো না কিছু। চোখ দিয়ে তার টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়লো। বললো, এ তুই কী করলি ভাই? আর একটু থাকতে পারলি না? আমার কথা না শুনে তুই ওই জলটুকু খেয়ে ফেললি? এ যে ডাইনী বুড়ির চক্রান্ত। এখন আমি তোকে নিয়ে কী করি বল তো। দুঃখের ভারে মেয়েটি সেই পথের ধারে বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল।

ঠিক সেই সময় ওই পথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এক সওদাগর যাচ্ছিল। বয়সে সে তরুণ। এমন নির্জন জায়গায় ফুটফুটে চাঁদের মতো একটি মেয়ে আর তার সঙ্গে কালো কুচকুচে একটি ছাগলছানা দেখে সওদাগর নামলো ঘোড়া থেকে। মেয়েটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কে তুমি? এই নির্জন পথে একলা বসে কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার?

সওদাগরের মিষ্টি কথা শুনে মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে তাকে সব কথা শোনালো। বড় দয়া হলো সওদাগরের। সে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাইলো আর তার ভাইটিকেও বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা বললো।

মেয়েটি সওদাগরের কথায় রাজী হলো। তার ভাইকে নিয়ে সে সওদাগরের সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়ে উঠলো। কয়েকদিন

ও নাকি তোমার ভাই ছিল!

পরে খুব ধুমধাম করে সওদাগরের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল।

ছাগলছানা বেশির ভাগ সময় বাড়ির মধ্যেই চলাফেরা করে আর কখনো কখনো কচি কচি ঘাস খেতে কাছেই নদীর ধারে চলে যায়।

আরো কিছুদিন পরে সওদাগর একদিন চলে গেল দূর দেশে বাণিজ্য করতে। সওদাগরের বৌ তার ভাইকে নিয়ে বাড়িতে রইলো।

সওদাগরের বৌয়ের সব সময়েই কেমন যেন ভয় ভয় করতো। সে বেশ বুঝতে পারতো যে, ডাইনীটা যেন অদৃশ্য হয়ে সারাক্ষণ তার কাছে কাছে ঘুরছে। নিষ্ঠুর ডাইনীটা ভাইটিকে ছাগল করে দিল। আরো যে কত ক্ষতি করবে কে জানে!

একদিন সকালে সেই ডাইনীটা এক পরমাসুন্দরী মেয়ের বেশে এলো সওদাগরের বাড়ি। নানারকম গল্পগুজব করে সওদাগরের বৌয়ের মন জয় করলো। সওদাগরের বৌ কিন্তু কোনোদিন নদীতে স্নান করতে যেতো না। সেদিন ঐ সুন্দরী মেয়েটা একেবারে নাছোড়বান্দা। তার সঙ্গে তাকে নদীতে স্নান করতে যেতেই হবে। অগত্যা সওদাগরের বৌ চললো নদীতে। সঙ্গে চললো সুন্দরী মেয়ে সেজে সেই ডাইনীটা।

নদীতে পৌঁছে সওদাগরের বৌ যেই জলে স্নান করতে নেমেছে আর অমনি ডাইনীটা একটা ভারী পাথরের সঙ্গে তাকে বেঁধে জলে ডুবিয়ে দিল।

ছাগলটা তখন নদীর ধারেই কচি কচি ঘাসপাতা খাচ্ছিলো। সে সব দেখলো। কিন্তু তার কিছুই করার নেই। মনের দুঃখে সে আর বাড়ি গেল না। প্রায় সারাক্ষণই নদীর ধারে পড়ে থাকতো।

ওদিকে ডাইনীটা সওদাগরের বাড়ি ফিরে তার বৌয়ের পোশাক পরে সওদাগরের বৌ সেজে বসে রইলো। কিছুদিন পর সওদাগর বিদেশ থেকে ফিরে কিছুই টের পেলো না। সে ডাইনীকেই তার বৌ ভেবে নিলো।

এরমধ্যে নদীর ধারের ছাগলটার কথা অনেকেই বলাবলি করতে লাগলো। ছাগলটা নাকি নদীর ধারে জলের কাছে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ছুটে ছুটে যায় আর চিৎকার করে ডাকে। কথাটা সওদাগরের কানে গেল। ডাইনীও শুনলো।

ডাইনী ভাবলো, এই ছাগলটাই হয়তো তার বিপদ ডেকে আনবে। তাই সে একদিন সওদাগরকে বললো ঐ ছাগলটাকে কেটে ফেলতে।

সে কি! সওদাগর যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললো, তোমার ছাগল, ও নাকি তোমার ভাই ছিল, আজ তাকেই তুমি কাটতে বলছো?

সওদাগরের বৌ সেজে থাকা ডাইনীটা নাছোড়বান্দা। শেষে সওদাগর ছাগলটাকে কাটতে রাজী হয়ে নদীর ধারে লোক পাঠালো তাকে ধরে আনার জন্যে।

লোকগুলো নদীর ধারে গিয়ে ছাগলটার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল। তারা দেখলো, নদীর ধারে একই জায়গায় ছাগলটা বার বার ছুটে যাচ্ছে আর চিৎকার করে কাকে যেন ডাকছে। তারা ছাগলটাকে না ধরে ফিরে এসে সওদাগরকে সব কথা বললো। সব শুনে নদীর সেই নির্দিষ্ট জায়গায় জাল ফেলার ব্যবস্থা করলো সওদাগর।

ওদিকে ডাইনী তো ছাগল কাটবে বলে ছুরিতে শান দিতে বসেছে, আর বিরাট এক কড়াই জল গরম করতে চাপিয়েছে উনুনে।

নদীতে জাল ফেলা হলো। জালে উঠলো সওদাগরের সত্যিকারের বৌ। একটা পাথরের সঙ্গে সে বাঁধা ছিল। তার বাঁধন খুলে দিতেই সে লাফিয়ে উঠলো আর তার গায়ের জলের ছিটে লেগে ছাগলটাও পেল মানুষের আকৃতি—সেই আগের মতো হাসিখুশিতে উচ্ছল ছেলেটি।

সওদাগর এবার ডাইনীর সব চক্রান্ত বুঝতে পারলো। তক্ষুণি সে ঘরে গিয়ে ডাইনীকে ধরে তার সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বাঁধলো। তারপর চাবুক মেরে ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিল। ঘোড়াও ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই যে দৌড় লাগাল আজ পর্যন্ত সে আর ফিরে আসেনি।

(রুশী রূপকথা অবলম্বনে)

ছবি : সরোজ সরকার

স্বপনবুড়ো

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

গুটিয়ে তিনি ইহলোকের
সৃষ্টি করা পাততাড়ি
চিরশিশু স্বপনবুড়ো
স্বর্গলোকে দিলেন পাড়ি।
দিয়েছেন অনেক মোদের
কেনা যায় না দাম দিয়ে
আমরা আজ শ্রদ্ধা জানাই
চোখের জল আর প্রণাম দিয়ে।

ভবিষ্যতের ঠিকানা

অসিতকুমার চৌধুরী

কোস্ট গার্ডে চাকরি

ভারতীয় উপকূল রক্ষীবাহিনী ৪৫ জন নাবিক নেবে ডোমেস্টিক ব্রাঞ্চের (D.B.) এবং জেনারেল ডিউটি (G.D.) ব্রাঞ্চের জন্য।

শিক্ষাগত মান—মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছেলেরা জেনারেল ডিউটি ব্রাঞ্চের জন্য এবং অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্ররা ৫৫% নম্বর পেয়ে থাকলে দরখাস্ত করতে পারো। উভয় ক্ষেত্রেই ১ জুলাই, ১৯৯৩ তারিখে বয়সসীমা হবে ১৭ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। তফসিল জাতি/উপজাতি ছাত্ররা বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ৫ বছরের ছাড় পাবে।

শারীরিক যোগ্যতা—প্রার্থীকে লম্বায় হতে হবে কমপক্ষে ১৫৭ সেমি.। ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশের অধিবাসীসহ নেপালী, গোর্খা ও অসমীয়ারা লম্বায় ৫ সেমি. এবং লাক্ষাদ্বীপ ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ছাত্ররা ২ সেমি. ছাড় পাবে। ওজন হবে উচ্চতা ও বয়সের অনুপাতে। চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রয়োজন জেনারেল ডিউটি ব্রাঞ্চের জন্য ৬/৬ থেকে ৬/৯-এর মধ্যে, ডোমেস্টিক ব্রাঞ্চের জন্য ৬/১৮ থেকে ৬/৩৬-এর মধ্যে। জেনারেল ডিউটির ক্ষেত্রে চশমা অচল।

শূন্যপদের সংখ্যা—জেনারেল ডিউটি ব্রাঞ্চে শূন্যপদ আছে ৪০টি। তার মধ্যে তফসিল জাতিদের জন্য ৬টি, উপজাতিদের জন্য ৯টি, পুরানো সমরকর্মীদের জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত। ডোমেস্টিক ব্রাঞ্চে শূন্যপদ ৫টি। এর মধ্যে ১টি করে পদ তফসিল জাতি/উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত।

বেতন—মাসে প্রায় ১২০০ টাকা। এ ছাড়া বিনা খরচে খাওয়া-থাকা, পোশাক, চিকিৎসা ইত্যাদির সুবিধা আছে।

পরীক্ষার তারিখ নির্বাচিত প্রার্থীদের পত্র দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হবে। ৬ জুলাই, ১৯৯৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যে চিঠি না পেলে বুঝতে হবে তোমার চেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, সিকিম, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশের প্রার্থীদের পরীক্ষা হবে নর্থ-ইস্টার্ন জোনের অধীনে। পরীক্ষার কেন্দ্র হবে কলকাতা, পাটনা, শিলং, গুয়াহাটি ও হলদিয়াতে। উড়িষ্যার প্রার্থীদের কেন্দ্র হবে চিল্কাতে।

বেকার তফসিলীরা ডাক পেলে এবং তাদের স্থানীয় রেল স্টেশন থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রের দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটারের বেশি হলে যাবার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেন/বাস/স্টিমার ভাড়া পাবে।

আবেদন পত্র পাঠাবে এই ঠিকানায়: Commander, Coast Guard District H.Q. No: 8, Anchorage Camp, Haldia Dock Complex, HALDIA-721 605.

উড়িষ্যার প্রার্থীরা দরখাস্ত করবে ইস্ট জোনের এই ঠিকানায়—Commander, Coast Guard Region (East), Fort St. George, MADRAS-600 009.

দরখাস্ত করবে সাধারণ কাগজে নিচের বয়ানে ইংরাজি অথবা হিন্দীতে। সঙ্গে দেবে (১) শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, কাস্ট, N.C.C. খেলাধূলা ইত্যাদি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। (২) এখনকার তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ফোটো। (৩) নিজস্ব নাম-ঠিকানা লেখা ২২×১০ সেমি. মাপের একটি খাম

দরখাস্তের সঙ্গে সমস্ত কাগজপত্র সেলাই করে দিও। খামের ওপরে লিখে দিও—

APPLICATION FOR NAVIK (GD/DB) JULY. 1993 BATCH.

আবেদন পত্র ৬ জুলাইয়ের মধ্যে পৌঁছানো চাই ওপরের ঠিকানায়। দরখাস্তের বয়ান:

APPLICATION FOR THE POST OF NAVIKS (GD/DB)— JULY, 93 BATCH

(a) Full Name
(b) Postal address with Pin Code
(c) Date of birth (in Christian Era)
(d) Father's Name, profession & address
(e) Nationality
(f) Centre at which you wish to appear for examination /Interview
  (i) _____
  (ii) _____
(g) Branch for which applying (GD/DB)
(h) Whether belong to S/C, S/T
(i) Educatioal Qualification with percentage of marks/division obtained
(j) Proficency in Sports
(k) N.C.C. Certificates obtained
(m) Marital Status (if married, no. of Children)

I declare that the above particulars are correct to the best of my knowledge and belief.

I understand that action can be taken against me if these are found to be incorrect.

Date Signature

স্নেহের ছায়ায় মৃত্যু

অর্ঘ্য দাশ

কেশবদের বাড়ির কার্নিশে পায়রায় ডিম পেড়েছিল। কেশব আর তার বোন শ্যামা রোজ সকাল সন্ধ্যে কার্নিশে পায়রার আনাগোনা দেখত। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দুজনে চোখ রগড়াতে রগড়াতে কার্নিশের নিচে এসে দাঁড়াত আর দেখত, হয় পায়রা-বাবা, নয়তো পায়রা-মা সেখানে বসে আছে। আবার কখনো কখনো দেখত দুজনেই বসে আছে। পায়রা দুটোকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে দুজনের মনে না জানি কতই না প্রশ্ন জাগত—ডিমগুলো কত বড় হবে? কি রং হবে? কটা ডিম ওখানে আছে? ডিমের ভেতর থেকে বাচ্চাগুলো কিভাবে বেরোবে, বাচ্চাগুলোর ডানা কিভাবে গজাবে? পায়রার বাসা কেমন? কিন্তু ওদের এ কৌতূহল মেটাবার কেউ ছিল না। ঘরের কাজ ছেড়ে মায়ের বা লেখাপড়া ছেড়ে বাবার, এসবে মন দেবার সময় ছিল না। তাই দু' ভাই বোন নিজেদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর করে কৌতূহল মিটিয়ে নিত।

শ্যামা বলত, দাদা, বাচ্চাগুলো ডিম থেমে বেরিয়েই কি ফুর্‌র্‌ করে উড়ে যাবে।

কেশব জ্ঞানীর মতো গলা ভারি করে বলত, ধুর পাগলি, আগে পাখা গজাবে, তারপর আস্তে আস্তে উড়তে শিখবে।

বাচ্চাগুলোকে ওরা কি খাওয়াবে? শ্যামা প্রশ্ন করত।

কেশব বোনের এ জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত না। এভাবে তিন চার দিন কেটে গেল। দুই শিশুর মনে ডিমগুলো দেখার ইচ্ছে দিনে দিনে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠল। ভাবল, এতদিনে বুঝি ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে এসেছে। এখন বাচ্চাগুলোর জন্য দানার ব্যবস্থা করা দরকার। না করতে পারলে বেচারারা হয়তো খিদের জ্বালায় কাঁদতে কাঁদতে মরে যাবে।

এই বিপদের চিন্তায় দুই শিশু ব্যাকুল হয়ে উঠল। দুজনে মিলে ঠিক করল, কার্নিশের ওপর কিছু গমের দানা রেখে দেবে, তবে আর পায়রা দুটোকে দানার জন্য কোথাও যেতে হবে না।

শ্যামা খুশি হয়ে বলল, ঠিক বলেছ দাদা।

কেশব বলল, হ্যাঁ, কেনই বা আর বাইরে যাবে।

শ্যামা জানতে চাইল, আচ্ছা দাদা, বাচ্চাদের রোদ লাগতে

পারে না?

কেশবের খেয়াল হয়নি বাচ্চাদের রোদ লাগতে পারে। বলল, ঠিক বলেছিস তো। বেচারারা রোদ লাগলে তৃষ্ণায় বুক ফেটে মরে যাবে। ওপরে একটু ছায়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

অবশেষে দুই ভাই বোনে ঠিক করল বাসার ওপর একটা কাপড়ের ছাদ তৈরি করে দেওয়া দরকার। এও ঠিক হলো যে একবাটি জল আর কিছু চালও সেখানে রাখা দরকার।

দুই শিশু উৎসাহের সঙ্গে কাজে মেতে উঠল। শ্যামা মায়ের চোখ বাঁচিয়ে জালা থেকে চাল নিয়ে এল আর কেশব পাথরের তেলের বাটি ভালো করে ধুয়ে মুছে তাতে জল ভরে নিল।

এখন ওদের চিন্তা কিভাবে আড়ালের ব্যবস্থা করা যায়। কাপড়ের ছাদ করতে গেলে তো খুঁটির দরকার। খুঁটি কোথা থেকে পাবে? কেশব চিন্তায় পড়ে গেল। হঠাৎ ওর মনে হলো, আচ্ছা জঞ্জাল ফেলার ঝুড়িটা ওখানে আটকে দিলে কেমন হয়!

যেমন চিন্তা, তেমনি কাজ। কেশব শ্যামাকে বলল, যা জঞ্জাল ফেলার ঝুড়িটা নিয়ে আয়। দেখিস, মা যেন আবার জানতে না পারে।

শ্যামা বলল, ওটা তো ভাঙা, ও দিয়ে তো রোদ আটকাবে না।

কেশব বিরক্ত হয়ে বলল, তুই আগে নিয়ে আয় তো, আমি ফুটো বন্ধ করার ব্যবস্থা করছি।

শ্যামা দৌড়ে গিয়ে ঝুড়িটা নিয়ে এল। কেশব ভাঙা ফুটো মেরামত করতে লেগে গেল। তারপর ফুটোটা বন্ধ হয়ে গেলে একটা আংটায় আটকে বোনকে দেখিয়ে বলল, দেখ এভাবে এটাকে বাসার সামনে টাঙিয়ে দেব। তখন আর একদম রোদ আসবে না।

শ্যামা মনে মনে দাদার বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না। মুখে বলল, দাদা তোমার খুব বুদ্ধি!

গরম কাল। মা দুই ভাই বোনকে খাইয়ে শুয়ে পড়েছেন। এদিকে দুই ভাই বোন মাকে বোকা বানাবার জন্য চোখ বুঁজে ঘুমের ভান করে শুয়ে আছে। যেই দেখল মা ঘুমিয়ে গেছেন, অমনি দুজনে পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ল।

কেশব ঘরের ভেতর থেকে একটা টুল নিয়ে এল। শুধু টুলে নিচু হয়ে যাচ্ছে দেখে টুলের তলায় একটা জলচৌকি দিয়ে তারপর ধীরে ধীরে উঠল। এক একবার টুলটা নড়ে উঠছিল আর তখন কেশব যে কত কষ্টে টাল সামলাচ্ছিল তা একমাত্র কেশবই জানে। চাপা গলায় বোনকে ধমক দিয়ে বলছিল, ঠিক করে ধর, নইলে নেমে খুব মারব।

বেচারী শ্যামা কি করে। তার মন যে পড়ে আছে পায়রার বাসার দিকে। তাই বার বার চোখ চলে যাচ্ছিল কার্নিশের ওপরে আর সে জন্যই হাত আলগা হয়ে যাচ্ছিল।

কেশব যেই দেওয়ালের কার্নিশের ওপর হাত রাখল, অমনি পায়রা দুটো উড়ে পালাল। কেশব দেখল কয়েকটা খড়ের টুকরোর ওপর ডিমকটা পড়ে রয়েছে। ও গাছের ডালে যে ধরনের বাসা দেখেছে এ সে ধরনের বাসা নয়।

শ্যামা জিজ্ঞেস করল, কটা বাচ্চা দাদা?

কেশব বলল, এখনো বাচ্চা হয়নি। তিনটে মাত্র ডিম।

শ্যামা বলল, আমাকে একটু দেখাও না দাদা, ডিমগুলো কি রকম, বড়?

কেশব বলল, দেখাচ্ছি। আগে একটু ছেঁড়া কাপড় নিয়ে আয় তো। এর ওপর পেতে দিই। ডিমগুলো শুধু খড়ের ওপর পড়ে রয়েছে।

শ্যামা দৌড়ে গিয়ে একটা পুরনো ধুতি থেকে এক টুকরো কাপড় ছিঁড়ে আনল। কেশব ঝুঁকে পড়ে কাপড়ের টুকরোটা নিয়ে কয়েক ভাঁজ করে খড়ের ওপর পেতে দিল।

শ্যামা আবার বলল, আমাকে ডিমগুলো একটু দেখাও না।

কেশব বলল, দেখাচ্ছি, দেখাচ্ছি। আগে ঝুড়িটা তো দে। একটু ছায়া করে দিই।

শ্যামা নিচে থেকে ঝুড়িটা কেশবের হাতে দিয়ে বলল, এবার তুমি নেমে এসো, আমি একটু দেখি।

কেশব ঝুড়িটা ঠিকমতো আটকে দিয়ে বলল, যা, দানা আর জলের বাটিটা নিয়ে আয়। তারপর আমি তোকে দেখতে দেব।

শ্যামা দানা আর জলের বাটি আনল। ঝুড়ির নিচে দানা এবং জলের বাটি রেখে কেশব নেমে এলো।

শ্যামা বলল, এবার আমাকে উঠতে দাও দাদা।

তুই পড়ে যাবি।

তুমি ধরে রাখো, আমি পড়ে যাবো না।

না, ওসব হবে না। তুই উঠতে গিয়ে পড়ে যা, তারপর মা আমাকে মারুক আর কি। তারচেয়ে এখন থাক, ডিমগুলো এখন বড় আরামে আছে। বাচ্চা হোক তারপর তোকে দেখাব।

শ্যামার চোখে জল এসে গেল। বলল, ঠিক আছে, তুমি আমাকে দেখালে না। আমি মাকে বলে দেব।

মাকে বললে কিন্তু মারব বলে দিচ্ছি।

তাহলে তুমি আমাকে দেখালে না কেন?

দেখতে গিয়ে যদি তোর মাথা ফাটত?

ফাটলে ফাটত। দেখ, আমি ঠিক মাকে বলে দেব।

এমন সময় মা দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, দুপুরে বাইরে বেরোতে আমি বারণ করেছিলাম না। কে দরজা খুলেছে?

দরজা কেশবই খুলেছিল। তাই কেশবের ভয় হচ্ছিল, শ্যামা না এবার মাকে বলে দেয়। কেশব ওকে পাখির ডিম দেখতে দেয়নি। তাই ও মাকে বলে দিতে পারে। এদিকে আবার শ্যামার ভয় হচ্ছিল, ও মাকে বলে দিলে দাদা না আবার ওকে মারে।

মা দু ভাই বোনকে খুব বকলেন। বকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে পাখার হাওয়া করতে লাগলেন, যাতে দুজনেই আবার ঘুমিয়ে পড়ে। তখন ভর দুপুর। বাইরে লু চলছে। পাখার হাওয়া খেতে খেতে দু ভাই বোন ঘুমিয়ে পড়ল।

বেলা চারটে নাগাদ ঘুম থেকে উঠে শ্যামা দৌড়ে ঘর থেকে

বেরিয়ে কার্নিশের সামনে এসে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু সেখানে একটাও পায়রা দেখতে পেল না। তারপর মাটির দিকে তাকিয়ে দেখল ফাটা ডিম পড়ে রয়েছে। ভাবল পাখির বাচ্চাগুলো নিশ্চয়ই ডিম ফেটে পালিয়ে গেছে। এ খবরটা দাদাকে শোনাবার জন্য সে দৌড়ে ঘরে ফিরে এসে বলল, দাদা, দাদা, পায়রার বাচ্চাগুলো ডিম ফেটে উড়ে পালিয়ে গেছে।

কেশব বোনের কথায় ধড়ফড়িয়ে উঠে বাইরে এসে দেখল মাটিতে তিনটে ভাঙা ডিম, সেই সঙ্গে এক হলুদ রঙের পদার্থ ও ভাঙা জলের জায়গা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কেশব বুঝল, আর পায়রার বাচ্চা হবার উপায় নেই। তাই বোন যখন জিজ্ঞেস করল, পায়রাগুলো কোথায় উড়ে গেছে দাদা? তখন ও বলল, ডিমগুলো তো নষ্ট হয়ে গেল। পায়রার বাচ্চা আর হবে কোথা থেকে!

শ্যামার রাগ হলো, ভাবল এ দাদার জন্যই হয়েছে। দাদা ডিমগুলো না ছুঁলে কি এমন হতো! ওর শাস্তি পাওয়া দরকার। তাই মা যখন কেশবকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই ডিম ছুঁয়েছিস? তখন শ্যামা বলল, হ্যাঁ মা, দাদার জন্যই তো ডিমগুলো ফেটে গেল।

মা বললেন, তুই ওখানে উঠলি কি করে?

শ্যামা বলল, জলচৌকির ওপর টুল রেখে উঠেছে মা।

এই জন্যই তোরা দুই ভাই বোনে দুপুরে ঘর থেকে বেরিয়েছিলি?

শ্যামা বলল, মা, দাদা, ওপরে উঠেছিল।

আর তুই টুল ধরিসনি? কেশব পালটা অভিযোগ করল।

তুমি বলেছিলে, তাই ধরেছিলাম, শ্যামা বলল।

মা বললেন, তুই এত বড় হয়েছিস আর জানিস না পায়রার ডিম ছুঁলে সে ডিম আর পায়রাতে নেয় না।

শ্যামা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, তাহলে কি মা পায়রারা ডিমগুলো ফেলে দিয়েছে?

মা বললেন, নয়তো কি। তিন তিনটে প্রাণ নিয়েছিস, এখন এর ফল ভোগ কর।

কেশব কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমার কি দোষ মা। ডিমগুলো যাতে ভালো থাকে সে জন্য কাপড়ের গদির ওপর ওদের তুলে দিয়েছিলাম।

ছেলের কথা শুনে মায়ের হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু কেশবের মনের মধ্যে আরো কিছুদিন ভয় বিরাজ করতে লাগল। থেকে থেকেই মনে হতে লাগল, ডিমগুলো বাঁচাতে গিয়েই নষ্ট করে ফেললাম। এ কথা ভাবতে গিয়ে কখনো কখনো ওর কান্না পেয়ে যেত।

তারপর থেকে পায়রা দুটোকে ওদের বাড়িতে আর দেখা গেল না।

(মুন্সী প্রেমচন্দ-এর 'রক্ষা মে হত্যা' অবলম্বনে)

ছবিঃ সরোজ সরকার

বোনের কথায় এসে দেখল...

অগ্নিযুগের সৈনিক

প্রথম শহীদ প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী

চরণ দাস

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বিপ্লবীদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তাঁরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন বিদেশী রাজশক্তির হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতেই হবে। সশস্ত্র বিপ্লবই তার একমাত্র পথ। তাঁরা দল গড়লেন, তৈরি হলেন। প্রথম কাজ হিসাবে ঠিক হলো লেফটেন্যান্ট গভর্নরের রেলগাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হবে মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে। কিন্তু বোমা বিস্ফোরণের পর দেখা গেল তা বিরাট এক গর্ত সৃষ্টি করতে পারলেও আসল কাজ কিছুই হয়নি।

এরপর ঢাকায় এক প্রাক্তন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পিঠে গুলি চালান হলো, সে তখন রাতের ভোজ খাচ্ছিল। এইসব কাজ যতই দুঃসাহসিক হোক, ফল তেমন কিছু হলো না। মাঝ থেকে বিদেশী রাজশক্তি হুঁশিয়ার হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল খানাতল্লাসী ধরপাকড়।

বিপ্লবীরা এতেও দমলেন না। ততদিনে মুরারিপুকুরের গোপন আড্ডায় উল্লাসকর দত্ত আসল বোমা বানিয়ে ফেলেছেন। তার কার্যকারিতা যে কতটা পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যাবে। আলোচনা করে ঠিক হলো, দেওঘরের দিঘিরিয়া পাহাড়তলিতে ওই বোমার পরীক্ষা হবে।

একদল যুবককে বোমা পরীক্ষার কাজে শিক্ষা দেওয়া হলো। বোমা ছোঁড়ার পর তা মাটিতে পড়ার আগেই যিনি বা যাঁরা সেই বোমা ছুঁড়বেন তাঁকে বা তাঁদের উঁচু শক্ত কিছুর আড়ালে আত্মগোপন করতেই হবে। তা না হলে বোমার টুকরোর আঘাতে আহত হতে পারেন, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

সব কিছু ঠিকমত জেনে বুঝে বিপ্লবীরা ট্রেনে চেপে বসলেন। এই দলেই ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী। ঠিক সময় ঠিক জায়গাতে বোমাটা ওঁকেই ছুঁড়তে হবে। তেমনি প্রস্তুতি নিয়েই তিনি চলেছেন দেওঘরে।

প্রাণচঞ্চল, দেশের মুক্তির জন্য জীবন দিতে সবসময়ে প্রস্তুত প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন সবার বন্ধু। সবাই ওঁকে ভালবাসতেন। ভয় বলে কোনও কিছু ছিল না ওঁর মনে।

নির্দিষ্ট দিনে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সবাই গিয়ে হাজির হলেন নির্জন এক পাহাড়ী অঞ্চলে। সেখানে পাথর ছড়ান একটা জায়গা ঠিক করা হলো বোমা পরীক্ষার জায়গা হিসাবে।

প্রফুল্লচন্দ্র বোমা হাতে নির্দিষ্ট জায়গায় বিরাট একটা পাথরের আড়াল খুঁজে নিলেন। সঙ্গীরাও জায়গা খুঁজতে লাগলেন। খুবই শক্তিশালী বোমা। ছুঁড়েই আড়াল নিতে হবে যাতে ওটা মাটিতে পড়ে ফেটে কাউকে না আহত করতে পারে।

সবাই ঠিক মতো আড়াল নেবার পর প্রফুল্লচন্দ্র বোমাটা ছুঁড়লেন। কিন্তু তিনি ঠিকমতো পাথরের পিছনে লুকোবার আগেই শূন্যে স্থলে উঠল বোমাটা! মাটিতে না পড়ে শূন্যেই প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গেল। প্রফুল্লচন্দ্র ক'সেকেণ্ড হয়তো দেরি করে ফেলেছিলেন উত্তেজনায়। তাই ফেটে যাওয়া বোমার আঘাতটা তাঁর ওপরে এসে লাগল।

প্রচণ্ড আওয়াজের প্রতিধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রর সঙ্গী বিপ্লবীরা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। কোনও সন্দেহ ছিল না তাঁদের, দেশী পদ্ধতিতে তৈরি বোমা ঠিক কাজ দিয়েছে। কিন্তু তখনও তাঁরা বুঝতে পারেননি ওদিকে কি হয়েছে।

আড়াল থেকে বার হয়ে তাঁরা একে একে প্রফুল্লচন্দ্রর কাছে এসে স্তম্ভিত হলেন। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মারা গেছেন প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর অসাড় দেহটা পাথরের ওপরে পড়ে আছে।

এমন যে হবে তা তো ওঁরা কেউ ভাবেননি। এখন কি করা কর্তব্য তাই নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। মনের দুঃখ মনে চেপে তাঁরা বাধ্য হলেন বাস্তবকে মেনে নিতে। পাথুরে জায়গায় দেহ কবর দেওয়া যাবে না। তার জন্য চাই শাবল কোদাল গাঁইতি। সেসব তো কিছুই তাঁদের নেই। আগুন দেওয়াও যাবে না, কারণ তাতে যে প্রচুর কাঠ লাগবে তাও যোগাড় করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ধোঁয়া আশপাশের আদিবাসীদের মনে সন্দেহ জাগাবে। সুতরাং তাঁরা তাঁদের প্রাণের বন্ধুর দেহ ওখানেই ওভাবে ফেলে রেখে চলে এলেন। বিপ্লবী তাঁরা, দেশের মুক্তিই তাঁদের একমাত্র কাম্য। তার জন্য মায়া-মমতা দুঃখ-কষ্ট সবই তো জয় করার ব্রত নিয়েছেন তাঁরা।

পরদিন কজন বিপ্লবী আবার গিয়েছিলেন ওই জায়গায়। গিয়ে দেখেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রর দেহ ঠিক সেখানে তেমনি ভাবেই পড়ে আছে। ফিরে এসেছিলেন ওঁরা। তার পরের দিন দেওঘর ছাড়ার আগে আবার তাঁরা ওখানে গিয়েছিলেন বন্ধুকে শেষ বিদায় জানাতে। গিয়ে অবাক হয়েছিলেন তাঁরা। দেহ ওখানে নেই। নেই তাঁর ছেঁড়া জামা-কাপড় বা অন্য কোনও কিছুর নিদর্শন। সব কিছু অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হয়েছে।

ইংরাজ সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বহু বিপ্লবী প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছেন। আমরা গর্বের সঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণ করি। প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী সেই অর্থে হয়তো শহীদ নন। কিন্তু দেশের মুক্তিসংগ্রামে যে সব শহীদরা প্রাণ দিয়ে অমর হয়েছেন, তাঁদের হাতে অস্ত্র যোগান দিতে গিয়ে তিনি তাঁর প্রাণ দিয়েছিলেন। সে দিনের সেই পরীক্ষাই প্রমাণ করেছিল বিপ্লবীদের তৈরি বোমাও কত কার্যকরী। তাঁর প্রাণদানই তো ভবিষ্যতের বিপ্লবীদের এগিয়ে যাবার পথ খুলে দিয়েছিল। সেই হিসাবে এই দেশের প্রথম শহীদ তো তিনিই। দেশ স্বাধীন হবার পর এখন তাঁর নামও তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

নতুন ধাঁধা

১। তিন অক্ষরের নাম তার নহে সাধারণ
প্রথম দ্বিতীয় হয় বিরোধের কারণ
দ্বিতীয় তৃতীয় হৃদয়তে স্থান
প্রথম তৃতীয় করে কম্পমান।

—অর্চনা, অঞ্জন, অনুপম দত্তরায়
শাঁখারীপুকুর/বর্ধমান

২। জননী ও জোট
বাজাও দেখি এক চোট

—স্বপন ভুঁই
মানকানালী/বাঁকুড়া

৩। ধাঁধার কথা বলছি শোন
মাথা গেলেই শেষ,
পা কাটলেই গায়ের জোর
হাতের শোভা বেশ।

—পল্লব চ্যাটার্জী
নব ব্যারাকপুর/উঃ চব্বিশ পরগনা

৪। গুপ্ত, তাই করছি না প্রকাশ
লেজ বাদে গয়লা, নেই সন্দেহের অবকাশ।

—তিমিরবরণ চঁদ
গুসকরা/বর্ধমান

● বৈশাখ সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তরঃ ১। শহর ২। মন ৩। নিউটন ৪। বিশেষ ●

বলো তো আমি কে

সূত্র হেঁয়ালি

তোমাদের এক অতি পরিচিত গল্পের নায়ক আমি। আমার পরিচয় পেতে গেলে নিচের সূত্রগুলো দেখঃ

সূত্র একঃ যেখানেই রহস্যের আর বিপদের গন্ধ পাই আমি সেখানেই ছুটে যাই। তাই তো যেদিন আমার এক প্রতিবেশী এসে বললেন তাঁর কাকার চিঠি পাওয়ার পর থেকেই বাড়িতে ভূতের উপদ্রব চলছে, তখুনি আমি ছুটে গেলাম সেখানে আমার বন্ধুকে নিয়ে।

সূত্র দুইঃ ওঁর কাকার চিঠি পড়ে আর একটা নক্সা দেখে বুঝলাম কেন তাঁর বাড়িতে উপদ্রব শুরু হয়েছে। ভূতের পায়ের শব্দ শুনলাম। দেখলাম তার পদচিহ্ন। রহস্য ঘনীভূত হতে লাগল।

সূত্র তিনঃ সময় নষ্ট না করে ওঁকে নিয়ে আমি যাত্রা করলাম আফ্রিকার উদ্দেশে। আমার সঙ্গী হলো আমার বন্ধু, আমার প্রিয় কুকুর আর অনেকদিন থেকে আমায় যে দেখাশোনা করছিল সে।

সূত্র চারঃ পথেও আমাদের ওপর কম হামলা হয়নি! কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা নিরাপদে মোম্বাসায় পৌঁছই।

সূত্র পাঁচঃ সেখান থেকে বিপদসঙ্কুল অরণ্যপথ পেরিয়ে আমরা হাজির হই টাঙ্গানিকা হ্রদের ধারে উজিজি গ্রামে। চিঠির কথামতো খুঁজে বের করি সিংহদমন গাটুলা সর্দারকে।

এবার বলো তো আমি কে? প্রথম সূত্র থেকে যদি আমাকে ধরতে পার তাহলে বলব অসাধারণ, দ্বিতীয় সূত্র থেকে হলে চমৎকার; তৃতীয় সূত্র—খুব ভালো; চতুর্থ সূত্র—ভাল; আর পঞ্চম সূত্র থেকে হলে মোটামুটি। আমার নাম? ৪৭ পাতায় দেখ।

নতুন শব্দমালা

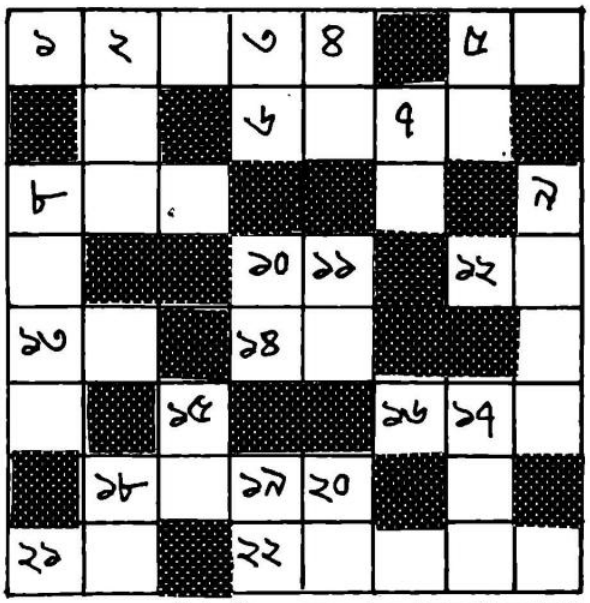

এটি তৈরি করেছেন : সুমন্ত রায় / কল্যাণনগর

সূত্রঃ

পাশাপাশিঃ

১। ভিক্টর হুগোর সৃষ্টি যিনি/এই চার্চে থাকেন তিনি
৫। আঙ সুন—নাম/শান্তি হেতু নোবেল পান
৬। ধনুক নয়, দৈর্ঘ্য নয়/আশ্রম সংখ্যা তিনে হয়
৮। গাছটি শুধু চিনে নেবে/ব্যথা বেদনা সেরে যাবে
১০। হাহা হিহি ঠাট্টা/মিঠে মিঠে খাট্টা
১২। বিপরীত খর্বকায়/বোঝো দেখি মহাশয়
১৩। বসন্তকাল আরবীভাষায়
১৪। দাবা সম্রাট—ফিশার
১৬। দুর্গম দুস্তর অগাধ যা/এই শব্দেও বোঝায় তা।
১৮। ফিলিপিনের আগ্নেয়গিরি
২১। ভারতীয় নকশার কারিকুরি
২২। ধর্মগুরু তিব্বতী/ভারতের অতিথি

উপর-নিচঃ

২। বাসুকির ভ্রাতা জানি
৩। বুদ্ধির খেলা মানি
৪। সব রহস্যের মূল কেন্দ্র
৫। নীরোগ যখন দেহযন্ত্র
৭। রাজার জোর যাদের জোরে
৮। রস টই টই চার অক্ষরে
৯। তীরন্দাজিতে রাখলো নাম
১০। চার্নকেরই অগ্রনাম
১১। সরস্বতীর আশীর্বাদে/ছন্দে মিলে শব্দ গাঁথে
১৫। সব ধনের সেরা ধন/জানেন তাহা প্রয়োজন
১৭। বানর জাতি লোমশ অতি/আফ্রিকাতে করে বসতি
১৮। অগ্নিশরীর ছুটে চলে/তারা খসাও একে বলে
১৯। গোঁ-এর সমার্থ
২০। নলযুক্ত কী অর্থ?

বৈশাখ সংখ্যার শব্দমালার উত্তরঃ

পাশাপাশিঃ

১। শমী ৩। ননী ৫। কবি ৭। চীন ৮। ভোলা
৯। মধু ১০। বামী ১২। কচ ১৪। আমি ১৬। ধারা
১৭। ইন্দ্র ১৮। শুনি ১৯। বিভা ২১। সুধা ২৩। রবি
২৫। বিনু ২৬। ভাই ২৭। শিশু

উপর-নিচঃ

১। শচী ২। মীন ৩। নভো ৪। নীলা ৫। কম
৬। বিধু ১০। বাধা ১১। মীরা ১২। কই ১৩। চন্দ্র
১৪। আশু ১৫। মিনি ১৯। বিবি ২০। ভানু
২১। সুভা ২২। ধাই ২৩। রশি ২৪। বিশু

পৌষ সংখ্যার বাকি উত্তরদাতাদের নামঃ

॥ **বাঁকুড়া** ॥

শান্তনু, শর্মিষ্ঠা, নীলাঞ্জন, রাজু ও রিন্টু/লোকপুর; মিলটন, কল্লোল, বুবাই, মৌসুমি, অষ্টমী, পার্থ, টুসি ও বৈশাখী/মনোহর; রনসু দাস, জিতু ও মোনালিসা/বিষ্ণুপুর; শরকৃষ্ণ চট্টসূর্য ও প্রতিমা দে/বিষ্ণুপুর; বাপী, বন্দনা ও শমনা রায়/প্রতাপবাগান; মধুমিতা ও পার্থ/গোবিন্দনগর; রাজ্যশ্রী, জয়শ্রী, রাজা ও অরূপ মিত্র/গঙ্গাজলঘাটি; শুভ্রা, মৌ, জয়িতা, রানা ও ভজ মিত্র/গঙ্গাজলঘাটি; তপতী ও তাপসী খাঁড়া/বিষ্ণুপুর রেল কলোনী; ইতু ও শম্পা মণ্ডল/ভড়া;

॥ **মেদিনীপুর** ॥

সোমা, সাথী, সুনন্দা ও দেবযানী রায়/গড়বেতা; শর্মিলা, সন্দীপ, কেয়া ও অসিত হাজরা/গড়বেতা; চন্দন, শমিতা, অর্পিতা, মা ও বাবা/হলদিয়া; বোধিসত্ত্ব, স্বাতী ও স্বস্তি মাইতি/কালিকাখালি; স্বর্ণেন্দু ও সুপ্তি নায়ক/গড়বেতা;

॥ **পুরুলিয়া** ॥

মোহন মণ্ডল ও শান্তি মাজী/রঘুনাথপুর; বৈশাখী ও কৌশিক চৌধুরী/এস.সি.মেন রোড; কল্পনা, বিকাশ, পলাশ, মিঠু, মৌসুমী ও চুমকি/লাগদা; মোহন, সুনীতা, কৃষ্ণা ও বুলু মণ্ডল/রঘুনাথপুর;

॥ **বিহার** ॥

প্রিয়নাথ ও শুভ্রা মাজী/কার্মিক নগর কলোনী, ধানবাদ; রুপেন ও নিরঞ্জন করগুপ্ত/জামসেদপুর; অনির্বান ও দেবানিকা ভট্টাচার্য/রাঁচি; সুস্মিতা, সুব্রত, মৌমিতা ও পারমিতা নামাতা/জামশেদপুর; ঋতুপর্ণা ও শ্রেয়পর্ণা মুখার্জী/ধানবাদ; জয়শ্রী, রাজশ্রী ও তনুশ্রী মাজী/ধানবাদ;

॥ **আসাম** ॥

উদয় ভট্টাচার্য/লামডিং; সমরকুমার দে/টিহু বিজি রেল কলোনী;

মাঘ সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নামঃ

॥ **কলকাতা** ॥
বুবাই, সোমা, বীণা ও মান্তু/মানিকতলা; টিনটিন, টার্জান ও বোলু/বাঘমারী; রুমা, রেখা ও পিঙ্কি/এ. পি. সি. রোড; সুইটি, বিউটি ও সানি/তালতলা; পাপুন, মিঠুন ও দিয়া/বেহালা।

॥ **বর্ধমান** ॥
ঋষি, শ্রী, সু ও বুয়ান/খালুইবিল; সুমেধা, দেবশ্রুতি, ঋতুপর্ণ ও সুশ্বেতা/বার্ণপুর; মায়া ও রুমা মণ্ডল/রাণীগঞ্জ।

॥ **বাঁকুড়া** ॥
শরৎকৃষ্ণ চট্টসূর্য ও প্রতিমা দে/বিষ্ণুপুর; শিখা ও স্বাতী ভাণ্ডারী/পিরিতচক রায়বাঘিনী; মিলটন, কল্লোল, মৌসুমী, বুবাই, অষ্টমী, পার্থ, বৈশাখী ও টুসি/মনোহরগ্রাম;

॥ **হাওড়া/হুগলী** ॥
সৌম্য, সৌরভ, সোনালী ও মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী/হাওড়া; সঞ্চারী ও মৌলীনা/রিষড়া; সৌরভ ও সোনালী ব্যানার্জী/হাওড়া-২।

॥ মেদিনীপুর ॥
কুমার গোরা বন্দ্যোপাধ্যায়/কোলাঘাট

বলো তো আমি কে? উত্তরঃ

যে বই কোনোদিন পুরোনো হবে না

টিভিতে যা দেখেছো তার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

আবার যখের ধন

দাম : ১৬ টাকা মাত্র

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ,
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

রিপোর্টার

নিখিল তরফদার

সকালবেলা শান্তি পিসী
ভাঙছে ব'লে তেলের শিশি
জানতে পেরে জেঠুমণি
দিছে নাকি খুব বকুনি।

ছোড়দা নাকি পড়তে বসে
ভুল-ভাল সব অঙ্ক কষে
শাস্তি স্বরূপ মাস্টামশার
চড় খেয়েছে গণ্ডা দু-চার।

লেট হয়েছে রান্নাতে মার
সেই রাগেতে অফিস যাবার
খানিক আগে বাবা নাকি
করছে মাকে বকাবকি।

বাড়ির এসব গোপন কথা
কে তুলে দেয় সবার কানে?
'রিপোর্টার' তো ছোট্ট খোকন
শ্রোতা যারা সবাই জানে।

ছবিঃ দিলীপ দাস

হাঁদা-ভোঁদার

উদ্ধারকার্য

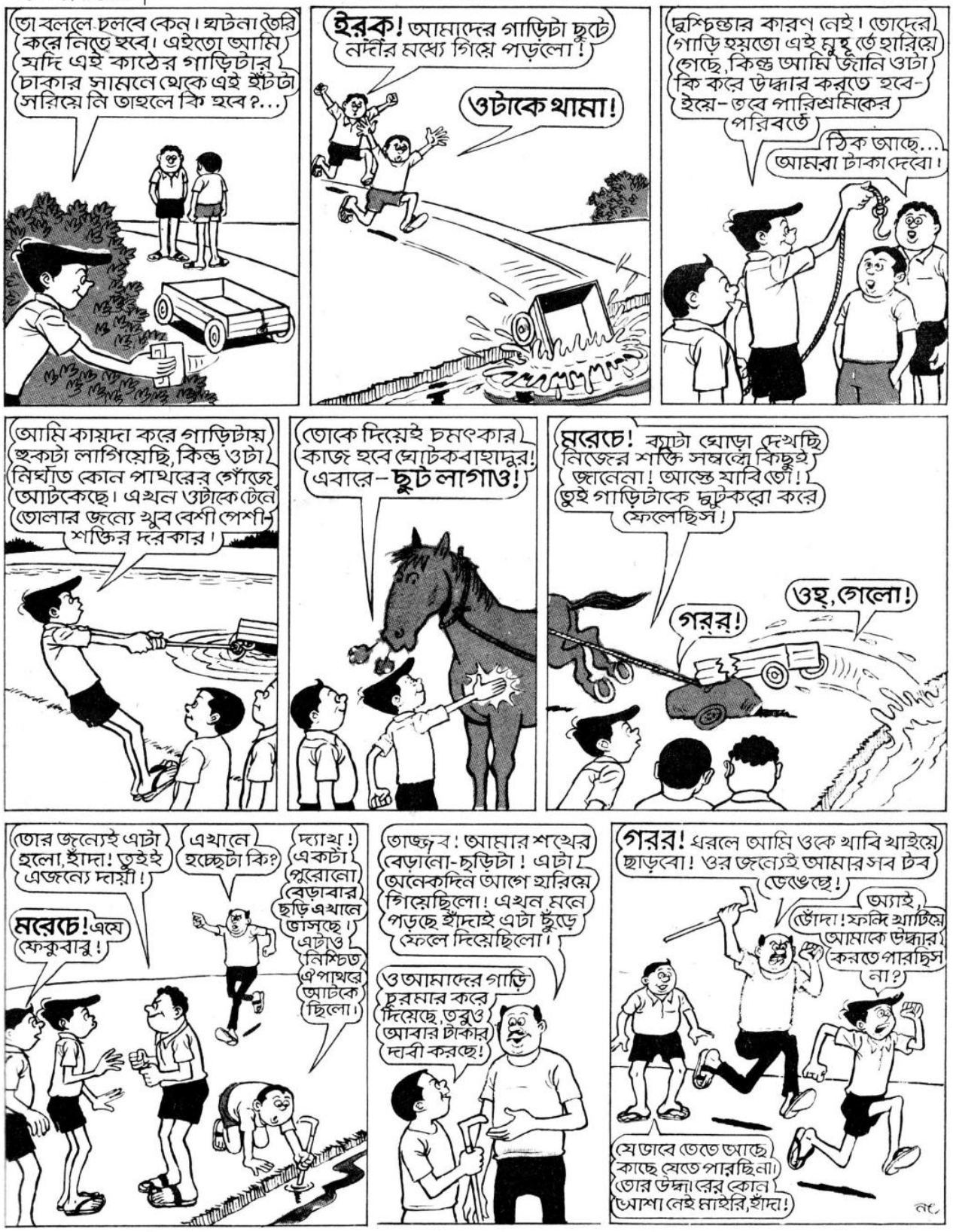

তা বললে চলবে কেন। ঘটনা তৈরি করে নিতে হবে। এইতো আমি যদি এই কাঠের গাড়িটার চাকার সামনে থেকে এই ইঁটটা সরিয়ে নি তাহলে কি হবে?...
ইরক! আমাদের গাড়িটা ছুটে নদীর মধ্যে গিয়ে পড়লো!
ওটাকে থামা!
দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তোদের গাড়ি হয়তো এই মুহূর্তে হারিয়ে গেছে, কিন্তু আমি জানি ওটা কি করে উদ্ধার করতে হবে-ইয়ে-তবে পারিশ্রমিকের পরিবর্তে
ঠিক আছে... আমরা টাকা দেবো।
আমি কায়দা করে গাড়িটায় হুকটা লাগিয়েছি, কিন্তু ওটা নির্ঘাত কোন পাথরের গোঁজে আটকেছে। এখন ওটাকে টেনে তোলার জন্যে খুব বেশী পেশী-শক্তির দরকার।
তোকে দিয়েই চমৎকার কাজ হবে ঘোটকবাহাদুর! এবারে-ছুট লাগাও!
মরেচে! ব্যাটা ঘোড়া দেখছি নিজের শক্তি সম্বন্ধে কিছুই জানেনা! আস্তে যাবি তো! তুই গাড়িটাকে দুটুকরো করে ফেলেছিস!
গরর!
ওহ্, গেলো!
তোর জন্যেই এটা হলো, হাঁদা! তুইই এজন্যে দায়ী!
এখানে হচ্ছেটা কি?
দ্যাখ্! একটা পুরোনো বেড়াবার ছড়ি এখানে ভাসছে। এটাও নিশ্চিত ঐ পাথরে আটকে ছিলো।
মরেচে! এযে ফেকুবাবু!
তাজ্জব! আমার শখের বেড়ানো-ছড়িটা! এটা অনেকদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিলো! এখন মনে পড়ছে হাঁদাই এটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো।
ও আমাদের গাড়ি চুরমার করে দিয়েছে, তবুও আবার টাকার দাবী করছে!
গরর! ধরলে আমি ওকে খাবি খাইয়ে ছাড়বো! ওর জন্যেই আমার সব টব ভেঙেছে!
অ্যাই, ভোঁদা! ফন্দি খাটিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে পারছিস না?
যে ভাবে তেতে আছে কাছে যেতে পারছি না। তোর উদ্ধারের কোন আশা নেই মাইরি, হাঁদা!
নং

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ

স্বামী মুক্তিকামানন্দ

(৬)

পশ্চিম ভারতে ঃ

স্বামীজীর ভারত ভ্রমণের স্পৃহা বেড়েই চলেছে। তাঁর নিজের মধ্যে চলেছে প্রচণ্ড এক আলোড়ন। তিনি বিরাট আমিত্বে মিশে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বকে একেবারে মিশিয়ে দিচ্ছেন মহামায়ার বিরাট রূপে—তবেই তো তাঁর পূর্ণত্ব, ঈশ্বর হয়ে ওঠা।

এবার ক্রমশঃ সবাই তাঁর মধ্যে দেখবেন—অকপটভাব, আড়ম্বরশূন্যতা, সব রকমের শিল্প-বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান, উদার মত, ধর্মপ্রাণতা আর অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি। এ ছাড়াও সঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতা, কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা, এমন কি রান্নাবান্নাতেও পটু। আদর্শের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রায় প্রস্ফুটিত।

হিমালয়ের কোলে তাঁকে দেখেছি সত্যদ্রষ্টা ঋষিরূপে। যেন দেবাদিদেব মহাদেব। মহাদেব মহাযোগী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, কঠোর তপস্যা ও নির্গুণ ধ্যানের প্রতীকস্বরূপ। এই কঠোর তপস্যা ও ধ্যানের ফলস্বরূপ তিনি সর্বপ্রকার ক্ষমতার অধিকারী। ঠিক যেন ভারত–আত্মার পূর্ণ প্রকাশ আমাদের স্বামীজী।

আলোয়ারে গুরুভাব জেগেছিল। খেতড়িতে ধর্মজীবনের সঙ্গে ব্যবহারিকবিজ্ঞান যোগ করতে পেরেছিলেন। জুনাগড়ে পৌঁছে তিনি ভারতের সংস্কৃতিকে আবার জাগাতে চান অগ্রদূত হয়ে।

জুনাগড় থেকে স্বামীজী গেলেন গির্ণার পর্বতে। সেখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন সবসম্প্রদায়ের বহু স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। দেখলেন 'খাপড়া খোদিয়া' গুহা। এই গুহাগুলো বিভিন্ন সময়ে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের মঠরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামীজীও একটি গুহায় কিছুদিন তপস্যা করে ফিরে গেলেন জুনাগড়ে। জুনাগড়কে কেন্দ্র করে তিনি ঘুরতে লাগলেন কাথিয়াওয়াড় অঞ্চল। প্রথমে গেলেন কচ্ছের রাজধানী ভুজ। তারপর ভেরাওয়াল ও প্রভাস তীর্থে। এই প্রভাস তীর্থেরই আরেক নাম সোমনাথপত্তন। সোমনাথের মন্দির বার বার বিধর্মীরা বিধ্বস্ত করেছে। আবার ভক্তেরা গড়ে তুলেছে। এই প্রভাসেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের তীরে বিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করেন। স্বামীজী এখানকার সব মন্দির দেখে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করলেন। প্রভাস তীর্থেই ভুজ রাজের সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হয়। রাজা তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মন্তব্য করেন, স্বামীজী একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার না ঘটিয়ে থামবেন না।

পোরবন্দর বা সুদামা-পুরী ঃ

জুনাগড়ে ফিরে এসে কয়েকদিন থাকার পর স্বামীজী গেলেন পোরবন্দরে। দেখলেন সুদামা মন্দির। রাজ্যের রাজা তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে রাজার দেওয়ান শ্রীযুক্ত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ রাজ্য চালাতেন। স্বামীজী তাঁর বাড়িতে অতিথি হলেন। দেওয়ানজী মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি সে সময় বেদের ভাষ্য প্রকাশ করছিলেন। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে সংস্কৃতে কথা বলে সংস্কৃত বলায় অভ্যস্ত হন আর ভাষ্য রচনার কাজেও সাহায্য করতে থাকেন। জুনাগড়ে থাকার সময়েই একবার স্বামীজীর বিদেশে যাওয়ার কথা উঠেছিল। পোরবন্দরের দেওয়ান পাণ্ডুরঙ্গজী স্বামীজীর প্রতিভা

দেখে তাঁকে আন্তরিকতার সঙ্গে সেই প্রস্তাব দেন এবং স্বামীজীও আনন্দে রাজী হন। তিনি ইতিমধ্যে ভারতের যত জায়গায় যত রাজদরবারে গেছেন সর্বত্রই গুণী লোকেরা অনুভব করেছেন ইনি এক মহাশক্তিধর মহাপ্রাণ পুরুষ, স্বদেশের বিশেষ কাজের জন্যে ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। স্বামীজীও এই সময় নিজের ভেতর অনুভব করছিলেন সেই প্রবল শক্তিকে, যে শক্তির বলে জগৎটাকে ওলট-পালট করে দিতে পারা যায় বলে তিনি মনে করতেন।

পোরবন্দরে অভাবনীয়ভাবে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হয়ে যায়। সে এক মজার ঘটনা। মরুতীর্থ হিংলাজ দেখতে যাওয়ার জন্যে অর্থভিক্ষা করতে একদল সাধুর সঙ্গে দেওয়ানজীর বাড়িতে এসেছিলেন ত্রিগুণাতীতানন্দ। তিনি মনে করেছিলেন, যে পণ্ডিত সাধুটি রাজঅতিথি হয়ে আছেন তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইবেন। কিন্তু সাক্ষাতে এসে দেখলেন তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বামীজীই সেই পণ্ডিত সাধু। এদিকে স্বামীজী ভাবলেন ত্রিগুণাতীতানন্দ তাঁকে বুঝি খুঁজে বের করেছেন। আসলে যে এটা দৈবমিলন সেটা বুঝতে পেরে স্বামীজী খুব খুশি হলেন আর ত্রিগুণাতীতানন্দের তীর্থদর্শনের সব ব্যবস্থা করে দিলেন। স্বামীজী এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দ্বারকায় এলেন।

দ্বারকা ঃ

শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত সারদামঠে মহান্তের সঙ্গে দেখা করে একটি ঘর চেয়ে নিলেন স্বামীজী। দ্বারকা ও বেটদ্বারকা ঘুরতে ঘুরতে ভাবী ভারতের রূপরেখা তিনি কল্পনা করতেন। জায়গা দুটি দেখা হলে কচ্ছের রাজার আমন্ত্রণে তিনি সেখানে গেলেন। এদিকে অখণ্ডানন্দজীও তাঁর প্রতিজ্ঞা মতো স্বামীজীকে খুঁজতে খুঁজতে মাণ্ডবীতে এসে শুনলেন স্বামীজী রাজার সঙ্গে নারায়ণ সরোবরে গেছেন, সেখান থেকে যাবেন আশাপুরি। তিনিও স্বামীজীর পিছু পিছু ধাওয়া করে শেষে মাণ্ডবীতেই এক শেঠের বাড়িতে এসে তাঁকে খুঁজে পেলেন। কিন্তু তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন তাঁকে দেখে। এ যেন এক নতুন স্বামীজী রূপলাবণ্যে ঘর আলো করে বসে আছেন। এ রূপ যে জগত মোহিত করে দেবে! স্বামীজী স্পষ্ট অখণ্ডানন্দজীকে জানালেন যে তিনি তাঁর পথের সন্ধান পেয়েছেন। সে পথে সিদ্ধি লাভ করতে তাঁকে একা একাই ঘুরতে হবে। অখণ্ডানন্দজী যেন তাঁর সঙ্গে না আসেন। অখণ্ডানন্দজীও বললেন তিনি স্বামীজীর পথের বাধা হতে চান না। কেবল তাঁকে একবার দেখতে মন কেমন করছিল বলেই তিনি অত কষ্ট স্বীকার করে তাঁকে খুঁজে বার করেছেন। স্বামীজী অখণ্ডানন্দজীর কাছে বিদায় নিয়ে পরদিনই ভুজ-এ চলে গেলেন।

ভুজ ঃ

ভুজ-এ পৌঁছে স্বামীজী দেওয়ানজীর বাড়িতে উঠলেন। দেওয়ানজী স্বামীজীর অগাধ পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্বপূর্ণ চালচলন, সহজ ভাষায় দুরূহ বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তার ফলে জুনাগড়ে যেমন হয়েছিল এখানেও তেমনি স্বামীজীকে কেন্দ্র করে নানান আলোচনাসভা বসত। এ সব সভায় ধর্মপ্রসঙ্গের সঙ্গে শিল্প, কৃষি, অর্থনীতি বিষয়ে ভারতের উন্নতি সাধনের উপায় নিয়ে আলোচনা হতো। জুনাগড়ের পর

স্বামীজী গেলেন পলিতানা। এখানে তিনি দর্শন করলেন জৈনদের পবিত্র স্থান শত্রুঞ্জয় পর্বত, হিন্দুদের হনুমানজীর মন্দির ও মুসলমান সাধুর সমাধিস্থান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা অতি মনোরম পরিবেশ। পূর্ব গৌরবের ধ্বংসাবশেষ দেখে স্বামীজী চিন্তা করতে লাগলেন ভারতের সেই গৌরব আবার কেমন করে ফিরে আসবে। ক্রমে হেঁটে ও ট্রেনে চড়ে তিনি নাড়িয়াদ স্টেশনে উপস্থিত হলেন। উঠলেন জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস মহাশয়ের বাড়িতে। নাড়িয়াদ থেকে গেলেন বরোদায়। বরোদায় গায়কোয়াড়ের দেওয়ান মণিভাই তাঁকে সাদরে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন।

২৬ এপ্রিল বরোদা ত্যাগ করে স্বামীজী বম্বে ও পুণা যান। সেখান থেকে গরমকাল কাটাতে মহাবালেশ্বরে হাজির হন। মহাবালেশ্বরে লিমড়ীরাজ ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তিনি স্বামীজীকে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে যান। এই ঠাকুর সাহেব বিদ্বান এবং নিজে ইউরোপের বহু দেশ দেখে এসেছেন, এমনকি দুবার আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। তিনি স্বামীজীর শিষ্য হয়ে গেলেন। ইনিই পাশ্চাত্য ভ্রমণ কাহিনী শোনানোর সময় স্বামীজীকে পাশ্চাত্যে যাওয়ার জন্যে উৎসাহ দেন।

লিমড়ীতে থাকাকালীন স্বামীজী একটা দুষ্টচক্রের হাতে প্রাণ দিতে বসেছিলেন। নিজের উপস্থিত বুদ্ধিবলেই সে যাত্রা তিনি বেঁচে যান।

রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে রাত কাটানোর জন্য আশ্রয় খুঁজছেন স্বামীজী। ঘুরতে ঘুরতে সাধুদের একটা আখড়া দেখতে পেয়ে সেখানে আশ্রয় চাইলেন। আখড়ার লোকজনও পরম সমাদরে তাঁকে থাকতে একটা ঘর দিল। কিছুক্ষণ পর পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা কথাবার্তা শুনে তিনি বুঝলেন ওখানে থাকা নিরাপদ নয়। তৎক্ষণাৎ সে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে চাইলেন স্বামীজী। কিন্তু আখড়ার লোকেরা বাধা দিল। তারা তাঁকে তাদের দুরভিসন্ধির কথা জানাল। ওই লোকগুলো অসুরদের মতো জাগতিক শক্তি লাভের জন্য তপস্যা করছিল। স্বামীজীকে দেখে একজন অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপরায়ণ ব্যক্তি বলেই মনে হয়েছিল তাদের। সিদ্ধিলাভের জন্য এমনই এক ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল।

এতবড় বিপদে পড়েও স্বামীজী কোনোরকম হঠকারিতা না করে ধীর স্থির থেকে এক বুদ্ধি আঁটলেন। বিপদের কথা খোলামকুচির ওপর দুচার শব্দে ইংরাজীতে লিখে তিনি তাঁর অনুগত একটি বাচ্চা ছেলের হাতে পাঠিয়ে দিলেন লিমড়ীর রাজার কাছে। খবর পেয়ে রাজা সৈন্য পাঠিয়ে স্বামীজীকে উদ্ধার করলেন। কাছে বসিয়ে পুজো করে স্বামীজীকে নিষেধ করে দিলেন এরপর থেকে কখনই যেন তিনি পরিচয়পত্র ছাড়া ভ্রমণ না করেন।

স্বামীজী ঠাকুর সাহেবের সঙ্গেই পুণাতে ফেরেন আর সেখান থেকে বম্বে হয়ে খাণ্ডোয়া যান।

(চলবে)

ছবি: বিজন কর্মকার

ঘোষণা

স্বামী বিবেকানন্দর ভারত পরিক্রমার শতবর্ষ এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর আবির্ভাবের শতবর্ষ উপলক্ষে শুকতারার পক্ষ থেকে বিশেষ গল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা হবে নিচের তিনটি বিভাগে:

ক বিভাগ-১০ বছর পর্যন্ত—বিষয়: গল্পের রাজা বিবেকানন্দ

খ বিভাগ-১১ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত—বিষয়: সর্দার বিবেকানন্দ

গ বিভাগ-১৫ বছরের উর্ধ্বে—বিষয়: শিক্ষক বিবেকানন্দ

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩১ জুলাই ১৯৯৩। কোনো লেখাই এক হাজার শব্দের বেশি হবে না। লেখার সঙ্গে লেখক-লেখিকার বয়েস, ক্লাস, স্কুল বা কলেজের নাম অবশ্যই দিতে হবে। লেখা পাঠাবার সময় খামের ওপর 'স্বামী বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি' কথাটি লিখে দিতে হবে। প্রত্যেক বিভাগে দুটি করে পুরস্কার থাকবে। তবে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প তিনটিই শুধু শুকতারার কার্তিক সংখ্যায় ছাপা হবে। প্রত্যেক বিভাগে পুরস্কার মূল্য সমান। প্রথম পুরস্কার—২৫০ টাকা: দ্বিতীয় পুরস্কার—১৫০ টাকা।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা—'স্বামী বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাঞ্জলি'

c/o সম্পাদক শুকতারা, ১১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বিল্টু-মন্টুদের ছবির খাতা ভরে উঠছে

শা. প্রি. ব.

বিল্টু-মন্টুরা অনেকদিন পরে হাসতে হাসতে স্কুলে গেলো।

আসলে সেজদাদুকে এতো খুশি হতে ওরা কোনোদিন দেখেনি। আর একটা খবর ওরা জানতো না, সেজদাদু এক সময় ভালো টেনিস খেলতেন। দিলীপ বসু, নরেশ কুমার, জয়দীপ মুখার্জী, প্রেমজিৎ লাল, আখতার আলিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রীতিমতো ঘনিষ্ঠ।

টেনিস নিয়ে বিল্টু-মন্টুরা ঠিক ততোটা মাথা ঘামায় না। ওদের প্রাণ ফুটবল আর ক্রিকেট। কিন্তু কলকাতায় ভারতের সঙ্গে সুইজারল্যান্ডের ডেভিস কাপের খেলা ওরা টিভিতে দেখেছিলো। কলকাতার ছেলে লিয়েন্ডারের খেলা দেখে ওরা আনন্দে নাচছিলো। প্রথম দিন ইয়াকব লাসেককে কতো সহজেই না হারিয়ে দিয়েছিলো লিয়েন্ডার। সেদিন রমেশকে অবশ্য হার মানতে হয়েছিল রসের কাছে। দ্বিতীয় দিনে রসে-লাসেক জুটিকে রমেশ-লিয়েন্ডার যেভাবে হারিয়ে দিয়েছিলো সে কথা কেউ কোনোদিন ভুলতে পারবে না। রসে-লাসেক বর্তমান বিশ্বের ডবলসের দু-তিনটি জুটির একটি। তাদের কিভাবেই না হারিয়ে দিলো লিয়েন্ডার আর রমেশ। তারপর

সাউথ ক্লাবে সুইজারল্যান্ডকে হারাবার পর লিয়েন্ডার পেজ, অক্রীড়ক অধিনায়ক নরেশ কুমার ও রমেশ কৃষ্ণণ।

দিন ফিরতি সিঙ্গলসে লিয়েন্ডারকে যেমন সহজে হারিয়ে দিয়েছিলো রসে তেমনি ভাবেই স্ট্রেট সেটে লাসেককে হারিয়ে রমেশ ভারতকে তুলে দিলো ডেভিস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে। কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতকে খেলতে হবে ফ্রান্সের সঙ্গে। সে খেলা হবে আগামী জুলাই মাসে।

ভারতের ওলিম্পিক হকি খেলোয়াড় ডাঃ ভেস পেজের ছেলে লিয়েন্ডার ছোট্ট থেকে মাঠে আসে। ওর মা জেনিফারও নামকরা

ডেভিস কাপের ডবলসে সুইজারল্যান্ডের জুটি রসে ও লাসেকের সঙ্গে খেলছেন ভারতের রমেশ কৃষ্ণণ ও লিয়েন্ডার পেজ।

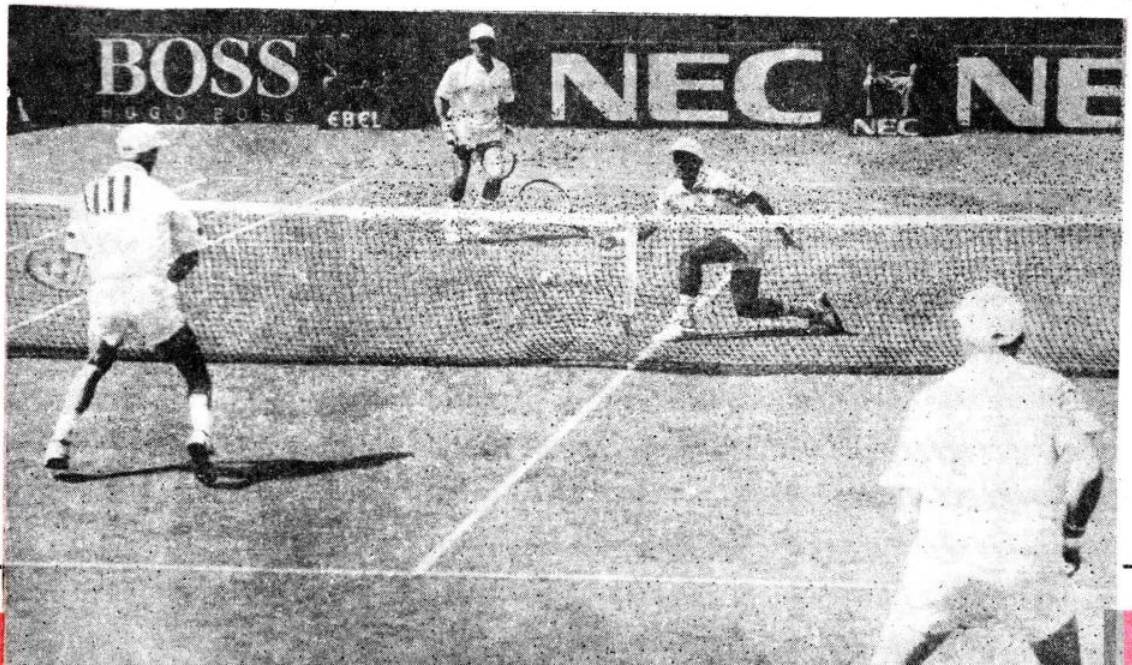

খেলোয়াড়। বাস্কেটবল ও হকিতে ভারতীয় দলে খেলেছেন। ওঁদের ছেলে যে খেলোয়াড়ই হবে তাতো বোঝাই গিয়েছিলো। সেই কথাই সেজদাদু বলছিলেন বিল্টু-মন্টুকে। ভারত তখন সবে ৩-২ খেলায় সুইজারল্যান্ডকে হারিয়েছে। সেজদাদুকে ভীষণ খুশি খুশি দেখাচ্ছিলো। হাসতে হাসতে বললেন, তিন-চার বছর বয়স থেকে লিয়েন্ডার ওর বাবার সঙ্গে মোহনবাগান মাঠে আসতো। দাপিয়ে বেড়াতো সারা মাঠ। হাতে থাকতো একটা ছোট্ট হকি স্টিক। ওর বাবা মাঠে খেলছে আর ও খেলছে মাঠের বাইরে। আজো চোখ বুজলে পরিষ্কার তা দেখতে পাই। এক সময় টুকটাক ফুটবলও খেলতো। তারপরই ও চলে যায় টেনিসে। বাড়ির কাছেই কলকাতার সাউথ ক্লাব। সেখান থেকেই উঠে এসেছে ও। মাঝে কিছুদিন ও মাদ্রাজে গিয়ে বিজয় অমৃতরাজের টেনিস অ্যাকাডেমিতে খেলা শিখেছে। তারপরই ও উইম্বলডনে খেলতে গিয়ে জুনিয়ার বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলো। তারপর থেকে ও ভারতীয় ডেভিস কাপ দলে খেলছে।

একটু থেমে সেজদাদু বললেন, নরেশ আমায় ফোন করে বললো, লিয়েন্ডার এবার প্রথম সিঙ্গলস আর দ্বিতীয় দিনের ডবলসে যা খেলেছে অমন খেলা খেলতে ওকে ও-ই নাকি কোনোদিন দেখেনি।

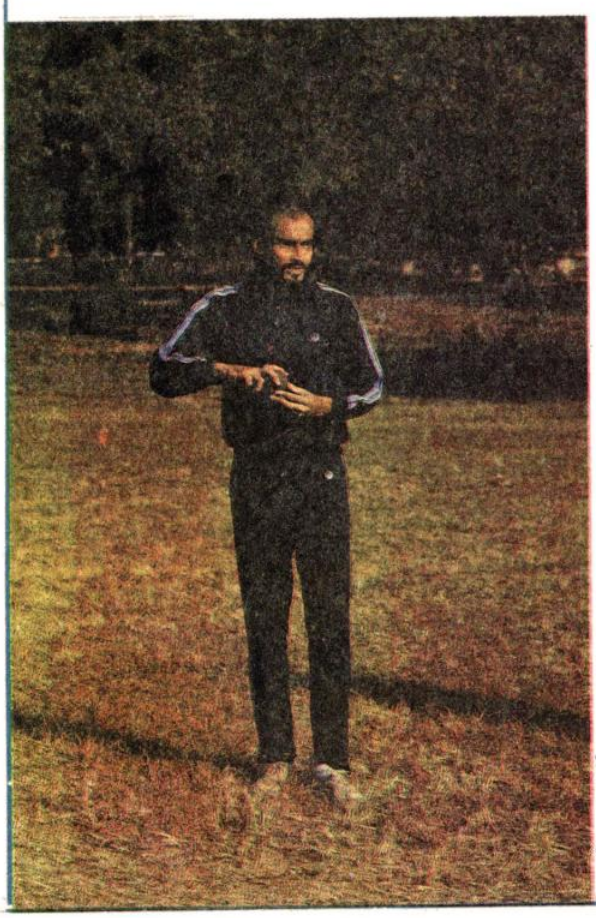
সুদীপ চ্যাটার্জি

সত্যিই কিন্তু তাই। কি দারুণ ফিট দেখাচ্ছিলো ওকে। সারা কোর্ট ও দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলো। বিশ্বের টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে লাসেকের স্থান তিরিশ জনের মধ্যে। আর লিয়েন্ডার দু'শ জনেরও বেশি পেছনে। কিন্তু লিয়েন্ডারের খেলা দেখে উল্টোটাই তো মনে হচ্ছিলো।

জানিস তো, খেলাধূলায় ফিটনেসটাই আসল। ফুটবল বল, ক্রিকেট বল সব খেলাতেই পুরোপুরি ফিট না হলে খেলা যায় না। টেনিসে বোধহয় আরো ফিট থাকার দরকার। জানিস তো, এখন পাওয়ার টেনিসের যুগ। সার্ভিসের স্পিড প্রায় দু'শ কিলোমিটার। ঐ রকম প্রচণ্ড জোরে ছুটে আসা বলের মোকাবিলা করা কি চাট্টিখানি কথা। মার্ক রসের সার্ভিসের জোর ঘন্টায় ১৯০ কিলোমিটারের ওপর। তাহলে ভাব অবস্থাটা। জিম কুরিয়ার, আন্দ্রে আগাসিরা আরো জোরে সার্ভিস করে। সার্ভিসের স্পিড এখন দু'শ কিলোমিটার ছাড়িয়ে গেছে। তাই বিয়র্ন বর্গের খেলায় যে চোখ জুড়ানো সৌন্দর্য ছিলো তা আজ আর দেখা যায় না। এর ওপর আছে 'এস' মার। ফলে টেনিস থেকে 'আর্টিস্টিক টাচ' বলতে যা বোঝায় তা একদম হারিয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় রমেশের খেলায় অবশ্য তার খানিকটা দেখা গেছে, ওর বাবা রমানাথনের খেলাও ঐ রকম সুন্দর ছিলো।

একটানা কথা বলে সেজদাদু থামতেই বিল্টু জিজ্ঞেস করলো, লিয়েন্ডার-রমেশ কি ফ্রান্সে গিয়ে জিততে পারবে?

অসম্ভব! হাসলেন সেজদাদু। বললেন, ফ্রান্সে গিয়ে খেলতে হবে লেঁকত আর ফোরজের সঙ্গে, তাও আবার 'ক্লে কোর্টে।' ঘাসের কোর্ট হলে ওদের হয়তো একটু বেগ দেওয়া যেতো। তবে খেলায় তো কিছুই বলা যায় না। সুইজারল্যান্ডকে যে ভারত হারাবে এ কথা তো কেউ ভাবতেও পারেননি। এই তো কিছু মাস আগে গতবারের ডেভিস কাপের ফাইনাল খেলা হয়েছিলো। সুইজারল্যান্ড খেলেছিলো আমেরিকার সঙ্গে। আগাসি, কুরিয়ার, ম্যাকেনরোরা লড়ে হারিয়েছিলেন রসে-লাসেকদের।

সেজদাদু হাসতে হাসতে বললেন, খেলাধূলার জগতে ভারতের সময়টা এখন একটু ভালো যাচ্ছে। না হলে পর পর চারটে টেস্ট ম্যাচে ভারত জিতেছে। তার মধ্যে তিনটিতে আবার ইনিংসে। একদিনের ক্রিকেটে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ভারত যে রকম দুর্দান্ত ভাবে ফিরে এসেছিলো সে কথাও কিন্তু ভোলার নয়। জিম্বাবুয়েকে তো সহজেই টেস্ট আর একদিনের ক্রিকেটে ভারত হারিয়ে দিয়েছিলো।

সেজদাদুর মন ভালো থাকলে বিল্টু-মন্টুদের আর দেখে কে। ওদের ছবির খাতা আবার বেরিয়েছে। একটার পর একটা ছবি কেটে সাঁটছে তাতে। কলকাতার লীগ ফুটবল শুরু হবার তোড়জোড় চলছে। দলবদলের পালা সারা। এখন ওরা হিসেব কষছে মোহনবাগানের শক্তি বেশি না ইস্টবেঙ্গলের। ওরা মোহনবাগানের

কথা বললেই স্কুলে ভন্টে-নন্টেরা ফুঁসে ওঠে। তারা ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান নিয়ে ওদের কত ঝামেলা হয়! এক একদিন তো এমন তর্ক হয়, এমন ঝগড়া হয় যে আড়িই হয়ে যায়।

ওদের তর্ক করার আর একটি নতুন বিষয় হলো বিনোদ কাম্বলি। বেজায় ঝগড়া হয় ওদের। কে বড় খেলোয়াড় শচীন তেন্ডুলকার না বিনোদ কাম্বলি। বিল্টু-মন্টুর মতে শচীন, ভন্টেরা বলে বিনোদের কথা।

সেদিন শঙ্করকাকুকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলো বিল্টু-মন্টু। শঙ্করকাকু খুব হেসেছিলেন। বলেছিলেন, ওরা দুজনেই বড় খেলোয়াড়। ওরা দীর্ঘদিন ভালো খেললে ভারতেরই তো সুবিধে। জানিস তো ওরা দুজনে স্কুল ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে। স্কুল ক্রিকেটে জুটি বেঁধে ওদের চেয়ে বেশি রান পৃথিবীতে আর কেউ করতে পারেনি। এ সেই ১৯৮৭-৮৮ সালের কথা। শচীন আর বিনোদ তখন বোম্বাই-এর সারদাশ্রম স্কুলে পড়ে। সেন্ট জেভিয়ার্সের সঙ্গে খেলতে নেমে দুজনে মিলে তৃতীয় উইকেটে ৬৬৪ রান করে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলো। সেই রেকর্ড আজো আছে। শচীন ৩২৬ আর বিনোদ ৩৪৯ রান করে অপরাজিত ছিলো। এখন ওরা যদি জুটি বেঁধে দীর্ঘদিন এই রকম খেলে তবে তো ভালোই। তবে শচীনকে এখন আরো ভালো খেলতে হবে। ৩০ থেকে ৭০ রানের মধ্যে ও বার বার আউট হয়ে যাচ্ছে। এমন হলে তো চলবে না। ওর এখন মনঃসংযোগ বাড়ানো দরকার।

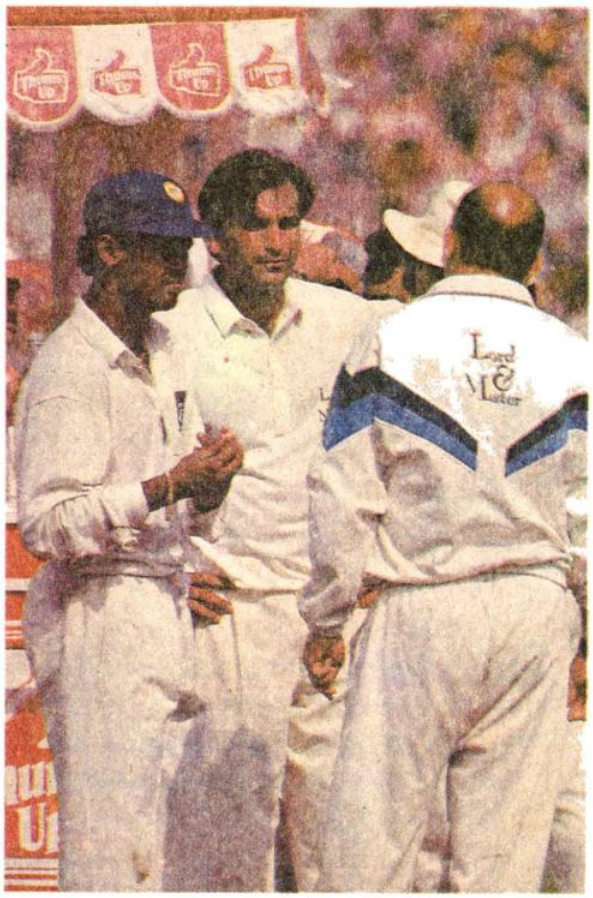

রাজেশ চৌহান, বিনোদ কাম্বলি

ছেলেবেলার গল্প

ভিলাই-এ সেদিন দারুণ হৈ চৈ। সন্দীপ পাটিল ভিলাই-এ এসেছেন। সেদিন বিকেলে কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে সন্দীপ প্র্যাকটিশ করছেন। রাজেশের বয়েস তখন সতেরো। ইলেভেন থেকে টুয়েলভে উঠবে উঠবে করছে। কলেজে ভর্তি হয়ে কপিলদেবের মতো মিডিয়াম পেস বল করতো। কিন্তু ওদের স্যার—গেমস টিচার ওকে স্পিন বল করতে বলেছেন। ও এখন অফ স্পিন বল করে উইকেটও পাচ্ছে।

রাজেশ এখনও অনেক বড় স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্ন ওকে দেখতে শিখিয়েছেন ওর বাবা গোবিন্দ চৌহান। খেলাধূলার দিকে রাজেশের আগে কোনো টানই ছিলো না। যেদিন কলেজে ভর্তি হয়ে বাড়ি ফিরলো ও, সেদিন গোবিন্দ চৌহান ছেলেকে ডাকলেন। বললেন, পড়াশোনার পাশাপাশি আর কি করছো তুমি?

আমি তো ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাডমিন্টন খেলি।

ছেলের কথা শুনে বাবা হাসলেন। বললেন, তুমি তো জানো আমি রনজি ট্রফিতে খেলেছি। কলকাতায় গিয়ে ওখানকার বড় ক্লাবে খেলেছি। তোমার কাকা গোপালও রনজি ট্রফিতে খেলেছে। আমাদের বাড়ির ক্রিকেট ট্র্যাডিশনটা তোমায় ধরে রাখতে হবে। আমি চাই তুমি মন দিয়ে ক্রিকেট খেলো। আমি সেইদিনটির দিকে তাকিয়ে থাকবো যেদিন আমি দর্শক গ্যালারিতে বসে তোমার খেলা দেখবো। তুমি রনজি ট্রফিতে খেলবে, তারপর ভারতের পক্ষে টেস্ট খেলবে। পারবে তো?

আমি চেষ্টা করবো বাবা।

সেইদিন থেকে সব কিছু ভুলে ক্রিকেট খেলা নিয়ে পড়ে রইলো রাজেশ—সকলে যাকে রাজু বলে ডাকে। কয়েক মাসের মধ্যে অফ স্পিনার হিসেবে কলেজ দলের নিয়মিত খেলোয়াড় হয়ে গেলো। তখনই সন্দীপ পাটিল এলেন ভিলাই-এ। রাজেশ তো দারুণ খুশি। সন্দীপ পাটিলের মতো অতো বড় ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে নিশ্চয়ই অনেক কিছু শিখতে পারবে।

সন্দীপ পাটিলের বিরুদ্ধে বল করতে গিয়ে রাজেশ থ। ওর বলগুলো কতো সহজে বাউন্ডারিতে পাঠাচ্ছেন সন্দীপ। কিছুতেই

পেরে উঠছে না। আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু সন্দীপকে হার মানাতে পারছে না একবারও। ও যখন হতাশ হয়ে পড়েছে তখনই সন্দীপ এগিয়ে এলেন ওর কাছে। বল করার ব্যাপারে নানা রকম টিপস দিলেন। তারপর আবার গিয়ে ব্যাট নিয়ে দাঁড়ালেন। সন্দীপ পাটিলের নির্দেশ মতো বল করে ওঁকে বিপদে ফেলতে লাগলো রাজেশ। বার কয়েক আউট হয়ে গেলেন সন্দীপ। প্র্যাকটিশের পর ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, এইভাবে বল করে যাও, দেখবে খুব তাড়াতাড়ি তুমি নাম করে ফেলবে। বলা যায় না হয়তো....

আনন্দে লাফাতে লাফাতে বাড়ির পথ ধরলো রাজেশ। বাবাকে গিয়ে সন্দীপ পাটিলের খবরটা দিতে হবে। বলতে হবে উনি কি বলেছেন। কিন্তু বাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো রাজেশ। ওদের বাড়ির সামনে ভীষণ ভিড়। কি ব্যাপার! পায় পায় এগিয়ে গেলো।

হঠাৎ বেরিয়ে এলেন ওর কাকা গোপাল। রাজেশকে দেখে ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন।

কি হয়েছে কাকা?

দাদা আজ বিকেলে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন।

বাবা নেই! রাজেশ যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। কলেজ যাবার আগেও তো বাবার সঙ্গে কথা বলে গেছে। সন্দীপ পাটিলের আসার খবর দিয়েছে। আজ বিকেলে ওঁর সঙ্গে প্র্যাকটিশ করবে সে কথা বলে গেছে। সেই বাবা আর নেই। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো রাজেশ।

বাবার মৃত্যুর পর ক্রিকেট খেলা ছাড়া ওর মাথায় আর কিছু রইলো না। দিন রাত শুধু খেলা আর খেলা। বাবার স্বপ্ন ওকে সার্থক করতেই হবে। ভারতের পক্ষে টেস্ট খেলবেই।

বেশি দিন লাগলো না রনজি ট্রফিতে আসতে। মধ্যপ্রদেশ দলে খেলার ডাক পেয়ে গেলো। প্রথম ম্যাচ খেললো রাজস্থানের বিরুদ্ধে। সেই খেলায় ১১টা উইকেট পেয়ে নিজের স্থানটি পাকা করে নিলো। তারপরই এসে গেল দলীপ ট্রফিতে মধ্যাঞ্চলের পক্ষে খেলার সুযোগ। খেলা পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে। রবি শাস্ত্রী, সঞ্জয় মঞ্জরেকার, শচীন তেন্ডুলকারের বিরুদ্ধে বল করতে হবে। একটু ভয় পেলো রাজেশ। কিন্তু বল হাতে নেবার পর কেটে গেলো সব ভয়। দুর্দান্ত বল করলো। পেলো ১০৫ রানে ৮টি উইকেট। জিতলো মধ্যাঞ্চল। জেতালো রাজেশ চৌহানই। সারা ভারত জেনে গেলো অফ স্পিনার রাজেশ চৌহানের নাম। পরের খেলা উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে। সেই ম্যাচে ৬৮ রানে ৫টি উইকেট পেলো রাজেশ।

সকলেই ধরে নিলেন এবার ভারতীয় দলে চান্স পাবে রাজেশ। রাজেশও সেই স্বপ্ন দেখছে। ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবে ভারত। দল গড়ার তোড়জোড় চলছে। কাগজে কাগজে রাজেশের কথা লেখা হচ্ছে। দেখতে দেখতে এসে গেলো দল গড়ার দিন। আশায় আশায় বসেছিলো রাজেশ। না হলো না। ভারতীয় দলে চান্স পেলো না রাজেশ চৌহান।

প্রথমটায় খুব দুঃখ পেয়েছিলো। তারপর আবার মনপ্রাণ দিয়ে প্র্যাকটিশ শুরু করলো। ওদিকে চাকরিও পেয়ে গেছে সে। ভিলাই স্টিল প্ল্যান্টের স্পোর্টস অফিসার।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে গোহারা হেরে দেশে ফিরে এসেছে ভারত। এবার খেলা ইংলন্ডের সঙ্গে। কলকাতার প্রথম টেস্টেই ডাক পেলো খেলার। আর তারপর...সে কথা তো সকলেরই জানা।

কলকাতায় ভালো বল করার পরও মুখ শুকিয়ে বসেছিলো রাজেশ। জিজ্ঞেস করতেই বললো, বাবার কথা বড্ড মনে পড়ছে। বাবা বেঁচে থাকলে আজ কতো খুশি হতেন বলুন তো। বাবার বড় শখ ছিলো দর্শকাসনে বসে আমার খেলা দেখার। ইডেনের এই জনসমুদ্র দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, ঐ ভিড়ের মধ্যে যদি আমার বাবাও থাকতেন, তাহলে আজ আমার থেকে বেশি খুশি কেউ হতো না।

গুডবাই জিমি

জিমি কে বলো তো? -

হ্যাঁ জিমি আর কেউ নন মহিন্দর অমরনাথ। জিমি সম্প্রতি ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন। খবরটা অধিকাংশ কাগজে খুব ছোট করে ছাপা হয়েছে। অথচ মহিন্দর অমরনাথের মতো ব্যাটসম্যান ভারতে খুব কমই জন্মেছে। এক সময় তো ওঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানও বলা হয়েছিলো। তা হবে নাই বা কেন? তখন মাত্র ১১টা টেস্ট খেলেই জিমি করেছিলেন ১১৮২ রান। তার মধ্যে ছিলো পাঁচটা সেঞ্চুরি আর এগারোটা হাফ সেঞ্চুরি। কাদের বিরুদ্ধে তিনি ঐরকম দুর্দান্ত ব্যাট করেছিলেন জানো? তাঁরা হলেন ইমরান খান, সরফরাজ নওয়াজ, আব্দুল কাদির, অ্যান্ডি রবার্টস, ম্যালকম মার্শাল, মাইকেল হোল্ডিং আর জোয়েল গারনার।

মহিন্দর অমরনাথ টেস্ট খেলেছেন ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত। তারপর বোর্ডের সঙ্গে গোলমাল হওয়ায় এবং পুরো ফর্মে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়ায় তিনি নির্বাচকদের

জোকার বলেছিলেন। তারপর থেকে তাঁকে আর দলে নেওয়া হয়নি। অবশ্য এর আগেও তাঁকে বার বার দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু যতোবার বাদ দেওয়া হয়েছিলো ততোবারই তিনি ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের পারফরমেন্সের জোরে আবার জাতীয় দলে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর মতো মনের জোর ছিলো না বলে ওঁর বড় ভাই সুরিন্দর কিন্তু আর দলে ফিরতে পারেননি। অথচ সুরিন্দরের মতো স্টাইলিস্ট ন্যাটা ব্যাটসম্যান ভারতে খুব একটা বেশি জন্মাননি।

১৯৮৩ সালে ইংলন্ডে প্রুডেনসিয়াল বিশ্বকাপে ভারত যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলো তার পেছনে সব থেকে বড় অবদান ছিলো মহিন্দর অমরনাথের। ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর সেমিফাইনালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে খেলায় তিনিই ছিলেন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। তাই বিশ্বকাপ হাতে নিয়েই ভারতীয় দলের অধিনায়ক কপিলদেব সেটি তুলে দিয়েছিলেন জিমি অমরনাথের হাতে।

মনসুর আলি খান পাতৌদির পর ভারতের সব থেকে বুদ্ধিমান অধিনায়ক হতে পারতেন মহিন্দর। দিল্লি এবং উত্তরাঞ্চল দলের নেতৃত্ব করার সময় বারবার তিনি তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েও ছিলেন। তবু তাঁকে ভারতীয় দলপতি হবার সুযোগ কোনোদিন দেওয়া হয়নি। কেন কে জানে! সব থেকে মজার কথা হলো গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ যেবার টেস্ট খেলা শুরু করেন মহিন্দরও সেবার থেকে খেলছেন। গাভাসকার আসেন তার একবছর পরে। বিশ্বনাথ, গাভাসকার টেস্ট ক্রিকেটের আসর থেকে সরে যাবার পরও মহিন্দর অমরনাথ ভারতের পক্ষে দাপিয়ে খেলেছিলেন। তাঁকে সব সময়ই 'ক্রাইসিস ম্যান অফ দ্য টিম' বলা হতো। ভারত বিপদে পড়লে সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে বারবার ভারতকে বাঁচিয়েছেন তিনি। তবু তাঁকে কখনোই টানা খেলতে দেওয়া হয়নি। গাভাসকার টানা অর্থাৎ একটাতেও না বসে ১১৬টি টেস্ট খেলেছেন, বিশ্বনাথ খেলেছেন ৮৭টি। কিন্তু মহিন্দরকে কোনোদিনই টানা ১৩টির বেশি টেস্ট খেলতে দেওয়া হয়নি। কে জানে কেন? ওঁর বাবার স্পষ্টবাদিতার জন্যেই কি? জিমির বাবা লালা অমরনাথ টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের পক্ষে প্রথম সেঞ্চুরি করেন। ভারতের সব থেকে বুদ্ধিমান অধিনায়ক হিসেবে তাঁর

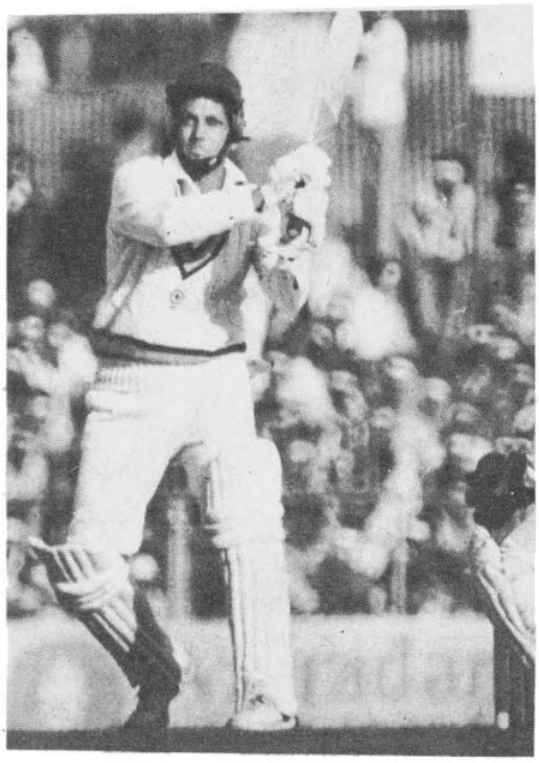

মহিন্দর (জিমি) অমরনাথ।

নামই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বোর্ডের কর্তাদের সম্পর্ক কোনোদিনই ভালো ছিলো না। আসলে মুখের ওপর সত্যি কথাটা যে তিনি বলে দিতেন, এখনো দেন। সেই রাগের শোধ কি ছেলেদের ওপর দিয়ে তোলা হলো? তা ছাড়া আর কীই বা বলা যায়! তা নাহলে ১৯৭০ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘদিনে কেন মহিন্দর অমরনাথ ৬৯টির বেশি টেস্ট খেলার সুযোগ পেলেন না! আর সুরিন্দরকেই বা কেন অকালে খেলা ছেড়ে দিতে হলো?

তবে মহিন্দর যে এখনো রিটায়ার করেননি এ কথাটা কিন্তু কেউ জানতেন না। তাই মহিন্দরের অবসর নেবার খবরে সকলে অবাক হয়েছেন। আমরা এই ফাঁকে মহিন্দর অমরনাথের কেরিয়ার রেকর্ডের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিই :

দেশ	টেস্ট	ইনিংস	অপরাজিত	রান	সর্বোচ্চ	সেঞ্চুরি	গড়
অস্ট্রেলিয়া	১৩	১৯	২	৭৭৩	১৩৮	২	৪৫.৪৭
ইংলন্ড	১১	১৯	১	৬৫৬	৯৫	০	৩৬.৪৪
নিউজিল্যান্ড	৬	১১	০	৪০৭	৭০	০	৩৭.০০
পাকিস্তান	১৮	২৮	৪	১০৮০	১২০	৪	৪৫.০০
শ্রীলঙ্কা	৪	৬	১	৩৮৫	১৩১	২	৭৭.০০
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৭	৩০	২	১০৭৬	১১৭	৩	৩৮.৪২
	৬৯	১১৩	১০	৪৩৭৭	১৩৮	১১	৪২.৪৯

ফুটবল খেলতে হলে

[জর্জ রেনর এক সময় খুবই নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন। ইংলন্ডের জাতীয় দলে নিয়মিত খেলেছেন দীর্ঘদিন। অবসর নেবার পর তিনি কোচের দায়িত্ব নেন। তারপর থেকেই তাঁকে নিয়ে গবেষণা শুরু হয়—খেলোয়াড় রেনর বড়, না কোচ রেনর বড়। এই প্রশ্নের উত্তর চট করে কেউ দিতে না পারলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কোচ হিসেবে রেনরের কীর্তি ছাপিয়ে গেছে খেলোয়াড় রেনরকে। জর্জ রেনর ফুটবল খেলা শেখার কিছু টিপস শুকতারার বন্ধুদের জন্যে দিচ্ছেন। পর পর ক'মাস ধরে তা ছাপা হবে।]

ফুটবল খেলার ধরন দিন দিন বদলে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক বছর আগে যে ভাবে খেলা হতো আজকাল আর সেইভাবে হচ্ছে না। তবে একটা কথা খেয়াল রেখো, ফুটবল খেলার প্রাথমিক ব্যাপারগুলো কিন্তু একই রকম থাকছে। সেই ব্যাপারগুলো ঠিক ঠিক ভাবে রপ্ত থাকলে খেলার ধরন কিংবা পদ্ধতি যতোই বদলাক না কেন কোনো অসুবিধেই হবে না। তাই সবার আগে এই জিনিসগুলোই রপ্ত করার দরকার।

যেমন ধরো কিক করার কথা। ফুটবল খেলায় কিক করার ব্যাপারটার গুরুত্ব তো তোমরা জানোই। আসল জিনিসই ওটা। তাই আজ তোমাদের কিক করার কথা বলছি। কারণ ভালো খেলোয়াড় হতে হলে পায়

কিক থাকা চাই-ই চাই।

একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে খুব স্বাভাবিক এবং সাধারণ ব্যাপার হলো একটা থেমে থাকা বা গতিহীন বল কিক করা। কিন্তু একপেয়ে মানে যে খেলোয়াড়রা এক পায়ের ওপর নির্ভর করে খেলে তাদের কাছে এই অতি সাধারণ ব্যাপারটাই রীতিমতো কঠিন মনে হবে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো যে পায়ে কিক করা হচ্ছে না তার অবস্থানটি। কারণ সেই পায়ের ওপরই দেহের ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারটা আছে। যেমন একটা গড়ানে বল কিক করার সময় যে পায় কিক করা হচ্ছে না সেই পাটি বলের কাছাকাছি মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে থাকবে। এর ফলে কিক নেবার মুহূর্তে খেলোয়াড়টির শরীর বলের খুব কাছে ধরতে গেলে একেবারে বলের ওপর এসে পড়বে। এই সময় খেলোয়াড়টির দু চোখ থাকবে বলের দিকে, হাঁটু প্রায় বলের ওপর, গোড়ালি উঁচুতে এবং পায়ের টো নিচের দিকে চাপা থাকবে, এই বার পায়ের চেটো দিয়ে বলটা সজোরে মারতে হবে।

উঁচু না করে বল যখন অনেক দূরে মারতে হবে তখন কিক না করা পাটি আরো খানিকটা পেছনে (অর্থাৎ বলের কিছুটা পেছনে) থাকবে। শরীরটাও হেলে যাবে পেছন দিকে। এরপরই বলটা মারতে হবে।

এরপর আসা যাক ভলির কথায়। ভলি মারার কৌশল একটু কঠিন হলেও যে কোনো খেলোয়াড়েরই এই কৌশলটা রপ্ত করার দরকার। ধরো, একটা বল মাটিতে পড়ে লাফাচ্ছে তখন কি করবে? এই সময় যে পা দিয়ে বলটি মারা হবে না সে পাটি মাটিতে থাকবে এবং ভলিকারী পাটি পেছন

দিকে যাবে। পায়ের এই নড়াচড়া খুব স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যায়। পা নাড়াচড়া করার সময় ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে তখন হাতকে কাজে লাগাতে হবে। ডান পা দিয়ে ভলি মারলে বাঁ হাত আর বাঁ পা দিয়ে মারলে ডান হাত এই কাজটি করবে। তারপর যে পা দিয়ে ভলি মারা হবে সেই পাটি সামনের দিকে টেনে এনে দু নম্বর ছবির মতো করে বলটি মারতে হবে লক্ষ্য স্থির করে। চোখ থাকবে বলের ওপর আর মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে থাকবে। যদি খুব উঁচু করে ভলি মারতে হয় তাহলে খেলোয়াড়টিকে তার শরীর পেছনের দিকে হেলিয়ে দিয়ে মারতে হবে।

পায়ের মধ্যভাগ বা ইনসাইড অফ দ্য ফুট দিয়ে ভলি করা অনেক সহজ। তাতে ভুলের সম্ভাবনাও কম থাকে। বলটির গোড়ালির নিচের হাড়ের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে এবং ছুরি মারলে হাতের যে অবস্থা হয় পায়ের অবস্থাও সেই রকমই হবে। পা হাঁটু থেকে ভেঙে অর্থাৎ বেঁকে যাবে আর অন্য পা থাই-এর সঙ্গে সমকোণে থাকবে। যতক্ষণ বলটির সঙ্গে পায়ের সংযোগ না হয় ততক্ষণ দু পায়ের অবস্থা ঐ রকম থাকবে। তারপর সামনের দিকে অথবা নিচের দিকে পা চালানোর ফলে বলটি লক্ষ্যপথে ছুটে যাবে। এইভাবে ভলি করে বলটি যখন উঁচু করে ফেলতে হবে তখনো কিন্তু পায়ের অবস্থা একই রকম থাকবে। তবে বলের সঙ্গে পায়ের সংযোগের মুহূর্তে সামনের দিকে একটু উঁচু করে পা চালাতে হবে।

হাফ ভলির কথা আসছে মাসে বলবো। আর একটা কথা, হাতের কাছে যখন আমায় পাচ্ছো না তখন কোনো অসুবিধে হলে যাঁরা ফুটবল খেলেন কিংবা খেলা শেখান তাঁদের জিজ্ঞেস করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে।

তোমাদের জিজ্ঞাসা

জয়ন্ত দত্ত (যশোর রোড, কলকাতা-৮০)

উত্তরঃ তুমি ক্যালেন্ডার সহ আজহারউদ্দিনের বড় ছবি চাইছো। এবার তো আর হলো না। পরে হবে। তা এবারের ক্যালেন্ডার কেমন লাগলো?

তনিমা ও তপন তরফদার (পাণ্ডবেশ্বর, বর্ধমান)

উত্তরঃ পরীক্ষা তো শেষ হয়ে গেছে। কেমন হলো? কপিলদেবের পোস্টার তো পেয়েই গেছো। নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছো।

শুভ্রা গায়েন (বাগপোতা রোড, সরসুনা, কলকাতা-৬১)

প্রশ্নঃ শিশির ঘোষের ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তরঃ শিশির ঘোষ c/o মোহনবাগান তাঁবু, কলকাতা ময়দান, কলকাতা—১।

সঙ্গীতা, বুলা, রুমা ও তানিয়া (মোহনপুর, নদীয়া)

উত্তরঃ বিনোদ কাম্বলির বড় ছবি পাবে। অনিল কুম্বলের বাড়ির ঠিকানা তো ছাপা যাবে না। ওঁর আপত্তি আছে।

দীপককুমার চ্যাটার্জি (বালটিকুরি গডঃ কোয়ার্টার্স, হাওড়া)

উত্তরঃ শচীন তেন্ডুলকারের বড়, রঙিন ছবি তো পেলে। খুশি তো?

সৌমেন রায় (ভানকার, মুর্শিদাবাদ)

উত্তরঃ তুমি ক্রিকেট খেলা শেখার জন্যে দুখীরাম কোচিং সেন্টার c/o এরিয়ান ক্লাব, কলকাতা ময়দান তাঁবু, কলকাতা-১ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারো।

উক্তি

কোনো দেশের ডেভিস কাপ দলের নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন হলে তাঁকে এইজন্য অনেক সময় দিতে হয়, অনেক ভাবনা, চিন্তা, পরিকল্পনা করতে হয়। ব্যাপারটা মোটেই সোজা নয়।

—বিজয় অমৃতরাজ

(ডেভিস কাপে নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেনদের বিষয় বলতে গিয়ে)

আমার আরো অনেক বেশি উইকেট পাবার কথা। কিন্তু কি করবো, এতো বেশি ক্যাচ পড়েছে আমার বলে যে কী বলবো। অবশ্য এই সব নিয়েই তো ক্রিকেট।

—রাজেশ চৌহান

(সদ্যসমাপ্ত টেস্ট সিরিজের পর এক সাক্ষাৎকারে)

স্বীকার করছি ওরা ওদের মনের মতো পিচ বানিয়ে খেলেছে। এর জন্য তো ওদের দোষ দেওয়া যায় না। সব দেশই তাই করে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ব্যাটিং, বোলিং এমন কি ফিল্ডিং-এও ওরা আমাদের টেক্কা দিয়েছে।

—কিথ ফ্লেচার

(দেশে ফিরে ইংলন্ডের হেরে যাবার কথা বলতে গিয়ে)

আর্সেনাল—লিয়েম ব্রেডির ক্লাব

সুমন ভট্টাচার্য

কুইজ প্রতিযোগিতায় যদি প্রশ্ন করা হয়, কোন ক্লাবের সদস্যদের 'গানার্স' বলা হয় তাহলে তোমরা কি উত্তর দিতে পারবে? সকলে না পারলেও কেউ কেউ নিশ্চয়ই পারবে। যাঁরা ফুটবল খেলার খোঁজ-খবর রাখেন তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে বিলেতের ফুটবলপ্রেমীরা আর্সেনাল ক্লাবের সদস্যদের ভালোবেসে গানার্স বলে ডাকেন। তা খেলার সময় সেই রকম ব্যবহারই তাঁরা করেন। সত্যিকারের কামান দাগা না হলেও তাঁদের জঙ্গী আচরণ খেলার পরিবেশ রীতিমতো উত্তপ্ত করে তোলে।

সে যাই হোক এই ক্লাবটি কিন্তু খুবই পুরোনো। ১৮৮৬ সালে যখন ক্লাবটির প্রতিষ্ঠা হয় তখন তার নাম ছিল রয়েল আর্সেনাল। আসলে একটি সরকারী কারখানার শ্রমিকরাই এই ক্লাবটি তৈরি করেছিলেন। শ্রমিকদের ক্লাব তাই গোড়ার দিকে টাকাকড়িরও খুব টানাটানি ছিলো। ফ্রেড বার্ডলে নামে এক ভদ্রলোক তখন ঐ ক্লাবের জন্যে খেলার সরঞ্জাম কিনে দিতেন। তবে ক্লাবের চেহারা বদলে যায় ১৯১৩ সালে। সেই বছর প্রখ্যাত রাজনীতিক এবং ধনী হেনরি নরিস ক্লাবের চেয়ারম্যান হন। নরিস সাহেবের প্রভাব আর ক্ষমতার জোরেই ক্লাবটি প্রথম বিভাগে খেলার সুযোগ পেয়ে যায়।

১৯২৫ সালে ক্লাবের খোলনলচে বদলে দিলেন হার্বার্ট চ্যাপম্যান। তাঁর চেষ্টায় আর্সেনাল শিরোনামে এসে গেলো এবং তিরিশের দশকে পাঁচ পাঁচবার (১৯৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৮ সালে) লীগ চ্যাম্পিয়ন হলো। এই সময় এই ক্লাবে খেলতেন এডি হ্যাপগুড, জ্যাব ক্রিস্টন, জো হালমে, ডেভিড জ্যাকের মতো খেলোয়াড়রা।

চ্যাপম্যানের পর ক্লাবের দায়িত্ব নেন টম হোয়াইটেকার। সেই সময়কার নামকরা খেলোয়াড়দের তিনি ক্লাবে টেনে আনেন। ফলও পাওয়া যায় হাতে হাতে। ১৯৪৮ ও ৫০ সালে তারা লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৫০ সালে এফ. এ কাপও জেতে। এর পর থেকে কিন্তু দীর্ঘদিন আর্সেনাল কোনো ট্রফি পায়নি। আবার তারা শিরোনামে আসে ১৯৬৯ সালে লীগে রানার্স হয়ে। সেই বছর তারা লীগে উইনার্স কাপের ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে সুইডেনের টাউন ক্লাবের কাছে ১-৩ গোলে হেরে যায়। কিন্তু পরের বছরই তারা বেলজিয়ামের আন্ডারলেক্ট ক্লাবকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে ইউয়েফা কাপ জেতে। ১৯৭১ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার সঙ্গে সঙ্গে এফ.এ কাপও জয় করে। সেবার এফ. এ কাপের ফাইনালে তারা লিভারপুলকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছিলো। ঐ বছর ইউরোপের বর্ষসেরা ফুটবল খেলোয়াড়ের সম্মান পান আর্সেনাল ক্লাবের ফ্র্যাঙ্ক ম্যাকলিন্টক। আশির দশকেও আর্সেনাল তাদের সাফল্য ধরে রেখেছে। এই দশকে তারা তিনবার এফ. এ কাপ জিতেছে। ইউরোপিয়ান কাপ উইনার্স কাপের ফাইনালে উঠেও তাদের ট্রাইব্রেকারে হার মানতে হয় স্পেনের ভ্যালেকসিয়ার কাছে। ১৯৮৯ সালে লিভারপুলকে হারিয়ে তারা লিটলউডস কাপও জিতে নেয়। নব্বই-এর দশকেও আর্সেনাল দাপিয়ে খেলছে। আর তাদের ক্লাবের সদস্যরা আনন্দে কামান দাগছেন খেলার মাঠে!

জানো কী

আষাঢ় মাস। আকাশ কালো। শন শন বাতাস। কখনো সখনো বৃষ্টি। বাজ পড়ার শব্দ। কি রকম যেন একটা গা ছমছম করা ভয় ভয় ভাব। তারই মধ্যে পুরোনো কিংবা ভাঙা বাড়ি আর মান্ধাতা আমলের গাছ-গাছালি থেকে নেমে এসেছে ভূতেরা। কিন্তু কোথায় গেলো তারা, করছেই বা কি তা জানতে পারবে ভূতের গল্পে ভরা শুকতারার আষাঢ় সংখ্যায়। কি থাকবে তার একটুখানি হদিস—

- ☐ ভূত নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে হাবুল নন্দীর আলাপ হলো ভূতবিশারদ তুবড়িলালের সঙ্গে। তুবড়িলালের কাছে ভূত ধরার একটা যন্ত্র ছিলো। হাবুল চাইলো সেটা কিনতে। আর তারপরই.....
- ☐ রঘুর হাতে এলো ননীর অদ্ভুত চিঠি, মরতে বসেছি, চলে আয়। বন্ধুর চিঠি পেয়ে ননী গেলো রঘুর পুরোনো দিনের পোড়ো বাড়িতে। সেখানেই...কি হলো?
- ☐ নার্সদের ট্রেনিংএর জন্যে কিনে আনা হলো একটা কঙ্কাল। তারপরই শুরু হলো বিচিত্র কাণ্ডকারখানা।
- ☐ থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম ক্লাবঘরের জানালার পাশে কালো পোশাক পরা লম্বা একটা লোক কান পেতে কিছু শুনছে। কি শুনছে সে?. লোকটাই বা কে?

এই সব প্রশ্নের উত্তরের পাশাপাশি আরো গল্প এবং আর যা যা থাকে সবই পাবে শুকতারার ভূতের গল্প নিয়ে বিশেষ এই আষাঢ় সংখ্যাটিতে।

পড়ার সঙ্গে খেলা

রাজপুর বিদ্যানিধি হাই স্কুল

চন্দন রুদ্র

দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজপুর বিদ্যানিধি হাই স্কুল এই অঞ্চলের একটি সুপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরিশীলিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনের আদর্শে বিদ্যায়তনটি পরিচালিত। আগামী ১৫ মে '৯৩ শুরু হচ্ছে এই শিক্ষায়তনের ১২৫তম বর্ষপূর্তি উৎসব। শিক্ষায়তন জুড়ে চলছে তারই প্রস্তুতিপর্ব।

১৮৬৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সময় শ্রীনাথ বিদ্যানিধি 'রাজপুর মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়'টি গড়ে তোলেন। ১৯৫৬ সালে শিক্ষায়তনটি উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ১৯৬২তে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়। এক সময় প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে বিদ্যায়তনটি 'রাজপুর বিদ্যানিধি হাই স্কুল' নামে পরিচিতি লাভ করে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বর্তমানে এখানে বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য বিভাগে মোট ১৩টি বিষয় পড়ার সুযোগ রয়েছে। গত বছরের মাধ্যমিকে ৯৪ শতাংশ ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ১ জন স্টার ও ১৫ জন ছাত্র পায় প্রথম বিভাগ। এই মুহূর্তে বিরাট এই শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫০০ জন।

পড়াশুনার সঙ্গে খেলাধূলা ও অন্যান্য বিভাগেও গ্রামীণ এই শিক্ষায়তনটির ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে। ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন গোলরক্ষক প্রতাপ ঘোষ এখানকার ছাত্র। প্রধান শিক্ষক মানস চট্টোপাধ্যায় জানালেন, স্কুলের খেলাধূলা বিভাগটি পরিচালনার জন্য স্পোর্টস কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। কাউন্সিলের পরামর্শদাতা হিসেবে রয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাক্তন কৃতী খেলোয়াড়, স্কুলের বর্তমান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রতি বছর খেলাধূলার উন্নয়নে কাউন্সিল বিভিন্ন পরিকল্পনা নেয়। তবে তাঁর আক্ষেপ, অর্থের অভাবে খেলাধূলার সব বিভাগগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। আগ্রহ থাকলেও শেষ পর্যন্ত ঐ ফুটবল, ক্রিকেটেই সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। তবু তিনি বললেন, আমরা নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ করে দেবার চেষ্টা করি। ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকগণ নানা রকম খেলার সরঞ্জাম কিনে দিয়ে প্রতিনিয়ত তাদের উৎসাহী করেন। ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের গুরুত্ব অপরিসীম। সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকারি সাহায্য ছাড়াই আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাই। সম্প্রতি স্কুলে একটি N.C.C. ট্রুপ খোলারও চেষ্টা চলছে বলে প্রধানশিক্ষক জানালেন।

স্কুলের সঙ্গেই রয়েছে নিজস্ব বড় একটি খেলার মাঠ। এখানেই ছাত্র-ছাত্রীরা সারা বছর খেলাধূলা ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। স্পোর্টস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের সাম্প্রতিক সাফল্যের কথা তুলে ধরতে গিয়ে শিক্ষক রবীন নাথ ও মনোরঞ্জন মণ্ডল বললেন, ১৯৮৮-৮৯ সালে দঃ ২৪ পরগনা জেলা আন্তঃস্কুল ক্রিকেটের ফাইনালে রাজপুর বিদ্যানিধি স্কুলের ক্রিকেট দল হরিনাভি ডি. ভি. এ. এস. স্কুলকে হারিয়ে জেলা চ্যাম্পিয়ান হয়। এর ফলে স্কুল দল রাজ্য পর্যায়ে দাত্তু ফাদকর ট্রফিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে তারা যাদবপুর হাই স্কুলের কাছে পরাজিত হয়। ১৯৯১ সালের সি. এ. বি. ক্রিকেট ও থামস-আপ ক্রিকেটে এই স্কুল সেমিফাইনালিস্ট। সোনারপুর স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীরা যোগদান করে। ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ফুটবল, অ্যাথেলেটিক্সেও ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত অংশ নেয়। ১৯৯১-৯২তে অ্যাথেলেটিক্সে রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ঝুমুর মিত্র কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। টেবিল টেনিসে চন্দনা ঘোষ ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে। যোগব্যায়ামে মুক্তো মণ্ডল, প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ রাজ্যস্তরে সাফল্য পেয়েছে।

কৃতী অ্যাথলিট ঝুমুর মিত্র

খেলাধূলার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের বিতর্ক, ক্যুইজ, বাগ্মিতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে বলে শিক্ষক প্রদীপকুমার নাথ জানালেন। সম্প্রতি ঐতিহাসিক ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে স্কুলে বসেছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিযোগিতার আসর। কিছু দিন আগে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো সম্মেলনের ওপর বাগ্মিতা প্রতিযোগিতায় ছাত্র সুমন্ত্র ব্যানার্জি সেরা পুরস্কার লাভ করে। এছাড়া সমাজসেবার ক্ষেত্রে রাজপুর বিদ্যানিধির ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা রয়েছে বলেও জানা গেল।

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

ছবি ১

সাইড বেনডিং ও স্ট্যানডিং স্ট্রেচিং

অপুষ্টির জন্য হাড়ের প্রান্তভাগ কম বাড়ে। লম্বা হওয়ার জন্য আমাদের সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। সুষম খাদ্য বলতে মণ্ডা-মিঠাই এই ধরনের দামী খাদ্য নয়। শাকসবজি, তার সঙ্গে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এগুলি যতটা সম্ভব ঠিক ঠিক পরিমাণ মতো খেতে হবে। যাদের ডিম খেয়ে হজম হয়, তারা পারলে একটা করে ডিম খেও। না পেলে সোয়াবিন, বরবটি, রাজমা, সিমদানা—এই ধরনের প্রোটিনগুলো খেতে চেষ্টা করবে। মাছ খেতে পারলেও ভাল হয়, তবে খুব বড় মাছ না খেয়ে ছোট মাছ খেও। যে সময় যা ফল পাবে সেই ফল নির্দ্বিধায় খেতে পার, তবে হজমের ব্যাপারটা সব সময় খেয়াল রাখবে। আবার বৈজ্ঞানিকরা এও দেখেছেন যথেষ্ট পুষ্টিতে হাড়ের বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু হাড়ের প্রান্তভাগ বড্ড তাড়াতাড়ি জুড়ে যাচ্ছে। ফলে বাড়ও কমে যাচ্ছে। তাই খাদ্যের ভূমিকাকে কখনই অস্বীকার করা উচিত নয়।

লম্বা হবার জন্য এবার যে ব্যায়াম দুটি শেখাচ্ছি তার প্রথমটি অম্বল, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি দূর করে, হজমশক্তি বাড়ায়। তাছাড়া শিরদাঁড়ার উপরে একটি পাশাপাশি চাপের সৃষ্টি করে। কোমর ও পেটের অতিরিক্ত মেদ কমায়। হ্যামস্ট্রিং অর্থাৎ উরুতের তলার পেশীটিকে লম্বালম্বি ভাবে টেনে বাড়াতে সাহায্য করে।

সাইড বেনডিং

দু'পা ছড়িয়ে যতটা পার দু'পায়ের মধ্যে ফাঁক রেখে হাত দু'টি মাটির সমান্তরাল দু'পাশে তুলে ছবির পিছনের মেয়েটির মতো বস। এখন শ্বাস নিতে নিতে ছবির সামনের মেয়েটির অবস্থানে এস। বাঁ হাতটি তুলে কানের পাশে নিয়ে যাও আর ডান হাতটি নামিয়ে বাঁ উরুর উপর রাখ। শরীরটা যতটা পার ডান পাশে বেঁকিয়ে দাও। পরমুহূর্তেই শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পূর্বের অবস্থানে অর্থাৎ পিছনের মেয়েটির অবস্থানে চলে যাও। একই ভাবে অপর পাশে অভ্যাস কর। দু'দিক মিলে একবার হলো। এই ভাবে প্রতিমাত্রায় ৮/১০ বার তোমার সাধ্যমতো কর। ২/৩ মাত্রায় অভ্যাস কর। মাঝে একটু বিশ্রাম নিও।

স্ট্যানডিং স্ট্রেচিং

এই ব্যায়ামটি খুবই সোজা। দেওয়ালের দিকে মুখ করে দু'হাত উপরে তুলে, দু'হাতের তালু দেওয়ালে লাগিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়াও। তোমার হাতের আঙুলগুলো যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, তার থেকে ২/৩ ইঞ্চি উপরে একটি লাইন টেনে রাখ। একইভাবে তারও উঁচুতে ২/৩টি লাইন টেনে রাখতে ভুলবে না। এবারে পায়ের গোড়ালি তুলে প্রথম লাইনটি ছোঁবার চেষ্টা কর। সহজ ভাবে ছুঁতে পারলে এবার তার উপরের লাইনটিকে ছোঁবার চেষ্টা কর। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই চেষ্টা ১৫/২০ সেকেন্ড চালিয়ে যাও। তারপর ১০/১৫ সেকেন্ড বিশ্রাম নেওয়ার পর আবার চেষ্টা করবে। বিশ্রামের সময় অল্প হাঁটাহাঁটি করবে। যখন দ্বিতীয় দাগটি স্পর্শ করতে পারবে তখন তার উপরের লাইনটা ছোঁবার চেষ্টা করবে। লম্বা হতে এই ব্যায়ামটি খুবই সাহায্য করে। এইভাবে ৪/৫ মিনিট অভ্যাস করবে।

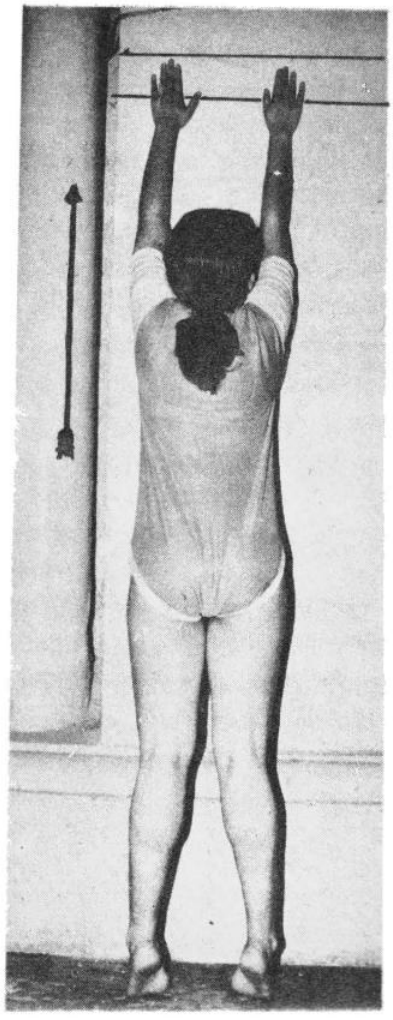

ছবি ২

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

সুইফ্‌ট টাটল

নামে সুইফট হলে কি হবে খুব আস্তে আস্তে চলাফেরা করে। মানে এর নিজের উপবৃত্তাকার কক্ষপথ একবার ঘুরতে সময় লাগে একশ তিরিশ বছর। সুইফ্‌ট টাটল বরফ আর কঠিন পাথর দিয়ে তৈরি একটি ধূমকেতু, যার আয়তন দশ কিলো মিটার। অনেকে বলছেন এটি একটি বড় উল্কা। এটি প্রথম আবিষ্কার করেন দুজন আমেরিকান জ্যোতির্বিদ লুইস সুইফ্‌ট এবং হোরাস টাটল ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে। ঐ সালে শিল্পীর তুলিতে আঁকা ধূমকেতুটির ছবি আর ১৯৯২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরে ধূমকেতুটির সর্বপ্রথম তোলা ফোটো তোমাদের জন্য দেওয়া হলো। এখন একটা প্রশ্ন এই ধূমকেতুকে নিয়ে এত হইচই কেন। এর কারণ প্রতিবছর আগস্ট মাসে পৃথিবী এই উল্কাটির কক্ষপথ পেরিয়ে যায়। যদি সুইফ্‌ট টাটল কখনো আগস্ট মাসে পৃথিবীর কক্ষপথে থাকে ও পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগে তাহলেই মুশকিল। প্রতি একশ তিরিশ বছর পর এরকম একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। ২১২৬ সালে নাকি পৃথিবীর সঙ্গে সুইফ্‌ট টাটলের ধাক্কা লাগার একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই ধাক্কা লাগলে কি হবে? ধাক্কা লাগলে পৃথিবীতে এক বিরাট গর্তের সৃষ্টি হবে। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস আর ধূলিকণায় পৃথিবী ঢাকা পড়বে। কয়েকমাস সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারবে না। সেজন্য পৃথিবীর সব জীব মরে যাবে। তুমি আমি কেউ বাঁচব না। যেভাবে বহুযুগ আগে এরকমই কোনো এক দুর্ঘটনায় পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে ডাইনোসোরস। তুষার যুগ নেমে এসে বিলুপ্ত হয়েছে ম্যামথ। সেই রকম পৃথিবীতে আবার নামবে তুষার যুগ। এরকম যাতে না হয় সেজন্য বিজ্ঞানীরা এখন থেকেই সুইফ্‌ট টাটলের দিকে সব সময় নজর রাখছেন। ধাক্কার সম্ভাবনা দেখা দিলেই সুইফটকে পরমাণু বোমা দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। অথবা শক্তিশালী পরমাণু চালিত যানের আঘাতে সুইফ্‌টকে তার কক্ষপথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। আর তা না পারলে ধাক্কাটাই হবে পৃথিবীর শেষ দিন।

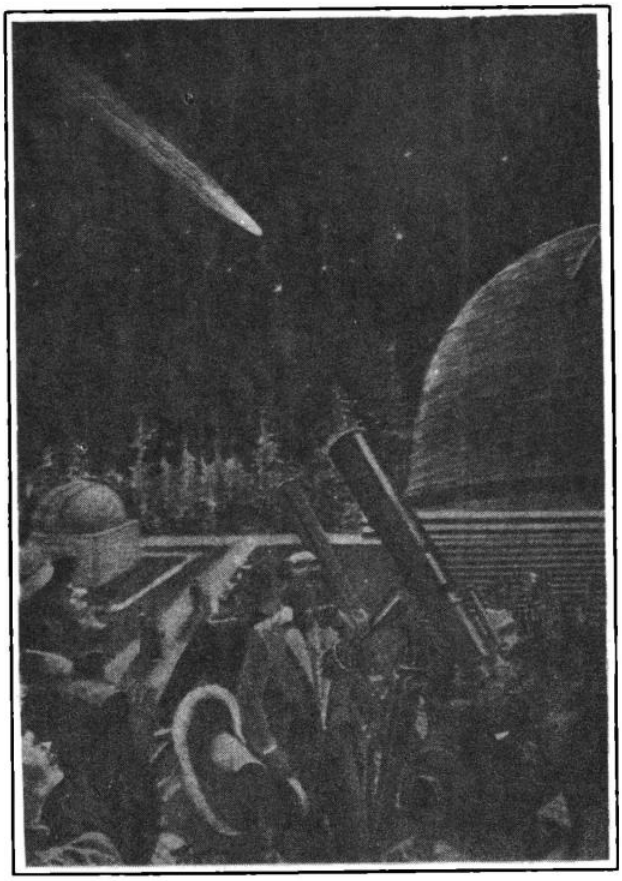

মহাবিশ্বের মহাকাশে

অনন্ত আকাশে বিরাজ করছে কোটি কোটি নক্ষত্র। যাদের অনেকেই আমাদের থেকে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে আছে। এই নক্ষত্রদের ছবি তোলা হয় তাদের যে আলো বিভিন্নভাবে পৃথিবীতে পৌঁছায় তা থেকে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই যন্ত্র দিয়ে বর্তমান যন্ত্র যে ছবি তোলে স্যাটেলাইট থেকে তার থেকে ১০০০ গুণ ভালো ছবি পৃথিবীতে বসে তোলা যাবে। যন্ত্রটির নাম কেমব্রিজ অপটিক্যাল অ্যাপারচার সিনথেসিস টেলিস্কোপ, সংক্ষেপে COAST।

দুই ব্রাইসন

জর্জ ডি ব্রাইসন নামে এক ভদ্রলোক ব্যবসার কাজে একবার সেন্ট লুই থেকে নিউইয়র্ক যাচ্ছিলেন। পথে পড়ে লুইসভিল নামে একটা জায়গা। এখানে তিনি আগে কখনো আসেননি তাই হঠাৎই জায়গাটা দেখবার তাঁর খুব ইচ্ছে হয়। ট্রেন থেকে নেমে তিনি সেখানকার সব থেকে ভালো হোটেল ব্রাউনে গিয়ে ওঠেন। হোটেল রেজিস্টারে নাম লিখে ঘরে যাবার পথে মজা করতে তিনি জিজ্ঞেস করেন তাঁর নামে কোনো চিঠি আছে কিনা। বলামাত্র তাঁর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় একটি চিঠি। খামে লেখা 'মিঃ জর্জ ডি. ব্রাইসন, রুম ৩০৭।' এই ঘরটাই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ব্রাইসন তো অবাক! এমনটা কি করে সম্ভব হলো।

খোঁজখবর নেবার পর জানা গেল ওই ঘরে আগে যিনি ছিলেন তাঁর নামও জর্জ ডি. ব্রাইসন। তিনি মনট্রিলের এক বিমা কোম্পানিতে কাজ করেন। এই অদ্ভুত ঘটনার পর দুই ব্রাইসন সামনাসামনি দেখা করে নিজেদের গায়ে চিমটি কেটে যাচাই করে নিয়েছিলেন তাঁরা দুজনেই সত্যি কিনা।

ক্রসওয়ার্ড পাজল

মিত্রশক্তি ঠিক করে ১৯৩৪ সালে তারা ইউরোপ আক্রমণ করবে। সেই মতো তোড়জোড়ও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সবকিছুই চলতে থাকে খুব গোপনে। পুরো পরিকল্পনাটার একটা গোপন সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়—'অপারেশন ওভারলর্ড'। এর এক একটা পর্যায়ের আবার আলাদা আলাদা সাংকেতিক নাম ছিল। যেমন নৌ-আক্রমণের নাম দেওয়া হয় 'নেপচুন'; ফ্রান্সের যে দুটি সমুদ্রসৈকতে সৈন্যরা নামবে সে দুটির নাম হয় 'ওমাহা' আর 'উটা'; যে কৃত্রিম বন্দরগুলি দিয়ে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হবে তাদের নাম হয় 'মালবেরি'।

এত ঢাকঢাক গুড়গুড় সত্ত্বেও আক্রমণের মাত্র ৩০ দিন আগে গোপন এই নামগুলো লন্ডনের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' কাগজের ক্রসওয়ার্ড পাজলে হঠাৎ বেরুতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, ২ জুন, আক্রমণের মাত্র ৪ দিন আগে পাজলের একটা সূত্রের সমাধান হিসাবে 'ওভারলর্ড' শব্দটি দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে কাগজের অফিস নিরাপত্তা-রক্ষীরা ঘিরে ফেলে। তারা ভাবে নিশ্চয় একজন নাজি গুপ্তচর পুরো ব্যাপারটা জানতে পেরেছে। তাদের সন্দেহ কিন্তু অমূলক ছিল। আসলে পাজলটা তৈরি করেছিলেন লিওনার্ড ড নামে এক স্কুল টিচার যিনি ২০ বছর ধরে ওই কাগজে

পাজল করে আসছেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় অবশ্য লিওনার্ড নিরাপত্তারক্ষীদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে ব্যাপারটা একদম কাকতালীয় ভাবেই ঘটে গেছে। তিনি কোনো দোষে দোষী নন।

যে রহস্যের সমাধান হয়নি

নিউইয়র্ক শহরে একটা লন্ড্রির দোকানে কাজ করত ইসিডোর ফিঙ্ক। ১৯২৯ সালের ৯ মার্চ রাত সাড়ে দশটায় সে খুন হয়। চিৎকার ও ধস্তাধস্তি শুনে পাশের বাড়ির এক মহিলা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে দেখে ফিঙ্ক যে ঘরে আছে সেটা ভেতর থেকে বন্ধ। তখন তারা দরজার ওপর ছোট জানলা দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলেকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা খোলে। দেহ পরীক্ষা করে দেখা যায় ফিঙ্ককে দুবার বুকে গুলি করা হয়েছে আর একবার হাতে। হাতে যেখানে গুলি লেগেছে তার চারপাশে পোড়া বারুদের দাগ।

পুলিশ এই কেস সমাধান করতে হিমশিম খেয়ে যায়। প্রথমতঃ ফিঙ্ক ঘরের দরজা সব সময় বন্ধ রাখত। সে ক্ষেত্রে খুনীকে ছোট জানলা দিয়ে ঢুকতে হবে। কিন্তু জানলাটা এতই ছোট যে একটা বাচ্চা ছেলে মাত্র গলতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ফিঙ্ককে যদি ছোট জানলাটা দিয়েই গুলি করা হয় তাহলে ওর হাতে পোড়া দাগ কখনই আসত না। এটা শুধুমাত্র খুব কাছ থেকে গুলি করলেই সম্ভব। দু বছর চেষ্টা চালানোর পর পুলিশ হাল ছেড়ে দেয়। ফিঙ্ককে কে গুলি করল তা রহস্যের আড়ালেই রয়ে যায়।

ছবি : সুফি

গোপা মিত্র স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

বিশালাক্ষ্মী মন্দিরে

বীথিকা দাশ

এ্যাই তুই আবার এসেছিস মন্দিরে? তোকে না আমি মানা করেছিলাম? চিৎকার করে কথাগুলো বললেন বিশালাক্ষ্মী মন্দিরের পুরোহিত রামগোপাল ঠাকুর।

হারান তবুও বসে থাকে মন্দিরপ্রাঙ্গণে। কোথায় যাবে ও? যেখানেই যায় সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। এখানে আসার আগে ও রঘুনাথপুরের ভাঙ্গা শিব মন্দিরে ছিল কিছুদিন। কিন্তু মন্দিরে থাকলেই তো হবে না। খাবার সন্ধানে ওকে দিনের বেলা বাইরে বেরুতে হতো। আর ওর এই পঙ্গু পা নিয়ে চলাও মুশকিল। শিব মন্দির থেকে তেমন প্রসাদ পাওয়া যেতো না। ওখানকার পুরোহিতই ওকে বলেছিলেন তিনটে গ্রাম পেরিয়ে বাসুদেবপুরে গেলে ওখানকার বিশালাক্ষ্মী মন্দিরেও থাকতে পারবে। সেখানে নিত্য ভোগ দেওয়া হয়। ওকে আর খাবারের সন্ধানে বাইরে বেরুতে হবে না। সেই কথা শুনে তেরো বছরের হারান বাগদী চলে এসেছিল বাসুদেবপুরের বিশালাক্ষ্মী মন্দিরে। মনে একটা আশা নিয়ে, এখানে হয়তো নিত্য প্রসাদ পাবে।

কিন্তু পুরোহিত কিছুতেই থাকতে দেবেন না ওকে। শিব মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে এই পুরোহিতের কোথাও মিল নেই। সব সময় রুক্ষ রুক্ষ কথাবার্তা।

কিরে মন্দিরের উপরে উঠে এলি যে? বনমালী, বনমালী, কোথায় গেলি? পুরোহিতের চিৎকারে বনমালী এসে মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়ায়।

চোখে দেখতে পাস না? মন্দিরে বাগদীর ছেলেটা ঢুকে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করছে। ওকে মন্দির থেকে বের করে দে। বাগদীদের থাকার জন্য মন্দির তৈরী করা হয়নি।

বিশালাক্ষ্মী মন্দিরের পুরোহিতের কথায় বনমালী হারানকে টেনে মন্দির থেকে নিচে নামায়। তারপর চলে চড়-চাপড়। হারান মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারায়।

কি ভাবে রাতটা কেটে যায় হারান টেরও পায় না। ভোরে ঘুম ভাঙ্গতে দেখে একটি বাচ্চা মেয়ে মন্দিরের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটা হারানের সামনে এক থালা ফল-প্রসাদ রেখে বলে, খেয়ে নাও, বাবা পাঠিয়েছেন।

হারান অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কে তোমার বাবা?

ঐ যে গো মন্দিরের পুরোহিত রামগোপাল ঠাকুর। আমি তাঁরই মেয়ে। ভয় নেই, তুমি খাও। বলে মেয়েটি মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায়।

একটু পরে বনমালী এলো মন্দিরপ্রাঙ্গণে। প্রসাদের থালা হারানের সামনে দেখে, ছুটতে ছুটতে গিয়ে খবর দিল ঠাকুরমশাইকে।

রামগোপাল ঠাকুর হারানের কাছে বিশালাক্ষ্মীর ভোগের থালা দেখে চিৎকার করে ওঠেন, ওরে অচ্ছুৎ, তোর এত বড় সাহস, তুই আমার বাড়ি থেকে মায়ের প্রসাদের থালা আনলি! এই থালায় আর ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া যাবে? বলে মারতে উদ্যত হন।

এ থালা আমি আনিনি ঠাকুর। এ তো তোমার মেয়ে আমাকে দিয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে কথাগুলো বলে হারান।

আমার মেয়ে? এবার একটু বিচলিত দেখায় ঠাকুরকে।

কি বলছিস তুই! ঠাকুরের তো ছেলে মেয়ে নেই! বনমালী বলে।

কিন্তু আমাকে যে বলল ও তোমার মেয়ে। তারপরই মন্দিরে ঢুকে গেল।

রামগোপাল ছুটে মন্দিরের কাছে গেলেন। দেখলেন সত্যিই ছোট ছোট আলতামাখা পায়ের ছাপ। বন্ধ মন্দিরের দ্বারের সামনে শেষ হয়েছে। এ তো স্বয়ং বিশালাক্ষ্মী মায়ের পায়ের ছাপ। নিজে এতদিন পুজো করেও মায়ের দর্শন পাননি। আর হারান! সত্যি কি ভুল করেছেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে রামগোপাল ঠাকুর দৌড়ে এসে হারানকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন।

গোপা মিত্র স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

মানুষ

সুব্রত পণ্ডিত

মা'গো পালিয়ে চলো। ওই কারা আসছে, হাতে মশাল। আমাদের বস্তি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। চলো মা, পালিয়ে চলো। বড্ড ভয় করছে আমার। মা'গো.....

কিসের ভয় বাবা! এই তো আমি। জল খাবি খোকা? গা

কি ব্যাপার ফতেমা ?

যে জ্বরে পুড়ে যায়।

ফতেমার গলা না? হ্যাঁ ফতেমাই তো। সন্ধ্যার জ্যোৎস্নায় বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ফতেমাকে। উসকো-খুসকো। ক্লান্ত। ছাতিমতলায় বসে আছে সম্বলহীন। হঠাৎ দেখলে হিম পাথরের মতো মনে হয়।

কি ব্যাপার ফতেমা? এ পথেই যাচ্ছিলাম। তোমার গলার স্বর চিনতে পেরে দাঁড়ালাম।

কান্নায় ভেঙে পড়ে ফতেমা। অসম্ভব কাঁপা কাঁপা গলায় বলে ওঠে, কারা কাল রাত্তিরে আমাদের বস্তি পুড়িয়ে দিয়েছে। নির্যাতন করেছে। বলেই দেখাতে থাকে ওর ছোট্ট শিশুর গায়ে চাবুকের দাগ।

আমি বিস্ময়ে হতবাক। এর চেয়ে বর্বরতা আর কি হতে পারে। গত পরশু থেকেই শহরের পরিস্থিতি ভাল নয়। একদল লোক মন্দির-মসজিদ বিতর্কে ধর্মের জিগির তোলায় সারা দেশ উত্তাল। এ শহরের কোথাও কোথাও কার্ফু বলবৎ করা হয়েছে। অত্যাচারে ঘরছাড়া বহু নির্দোষ মানুষ। ফতেমা এদেরই একজন। ফতেমাকে বললাম, এ কয়েকদিন আমার বাড়িতেই থাকবে। কেন জানি না ও সঙ্কোচ বোধ করছিল। অনেক বুঝিয়ে অবশেষে রাজী করানো গেল। এর জন্য ফতেমার কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। লজ্জিত হয়ে বললাম, তুমি না রক্ত দিলে কি করে বাঁচতো আমার একমাত্র ছেলে বাদশা! সে যে কী ভীষণ ভয়ানক দিন গেছে! পরিচিত কারো সঙ্গে বাদশার রক্তের গ্রুপ মিলছিল না। শেষে তোমার স্বামী আখতার তোমাকে রক্ত দিতে রাজী করিয়ে আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। তোমরা না থাকলে ওই মন্দিরের দেবতা কি আমার ছেলের প্রাণ বাঁচাতে পারত? আমার কারখানার সামান্য কর্মচারী আখতারই সেদিন দেবতা হয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল 'রক্তের কোনো জাত নেই।' আজ আখতার বেঁচে নেই। কিন্তু আখতারের মতো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তো এখনো এই পৃথিবীতে আছে। রক্তের যখন জাত নেই, সেই রক্তে গড়া মানুষের কেন জাত থাকবে ফতেমা? না না কোনো সঙ্কোচ নয়। তুমি বিশ্রাম কর। আমি ডাক্তারবাবুকে বলে তোমার ছেলের ওষুধের ব্যবস্থা করি। আর বাদশাকে পাঠিয়ে দিই। তুমি দ্যাখো বাদশা কত বড় হয়েছে।

বাদশা। বাদশা। এই তো—

কিছু বলবে বাবা?

বৈঠকখানার ঘরে বোস তো। দ্যাখ তোর এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছি। যা আলাপ কর।

বাবা।

আর কিছু বলবি?

বলছিলাম, তুমি যাদের নিয়ে এলে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখেছি। এ ছেলেটা তো আমাদের ক্লাসেই পড়ে। ওরা তো মুসলিম। বস্তিতে থাকে। ওদের কেন নিয়ে এলে বাবা? টুকাই, বুম্বা, মুন্না কেউ আমরা ওর সঙ্গে খেলি না। আমরা ওরা নাকি ভিন্ন জাত।

ছিঃ ছিঃ বাদশা। অমন কথা বলতে নেই। ওদের স[illegible] বড় পরিচয় মানুষ। পাঠ্যপুস্তকে তো পড়েছিস র[illegible], বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, নজরুল—এঁরা সকলেই বলেছেন, [illegible] সার মনুষ্যত্ব। তাছাড়া তুই তো জানিস না, যে বন্ধুকে [illegible] সরিয়ে দিচ্ছিস তার মায়েরই রক্ত একদিন বাঁচিয়েছে তোর জীবন। তোর যখন ভীষণ অসুখ হয় উনিই তোকে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। তাহলে? আসলে ঈশ্বরের কাছে জাত বলে কিছু নেই। তাঁর কাছে মানুষই সত্য। তুইও এই শিক্ষা আজীবন মনে রাখবি।

আমার কথায় বাদশার বুঝি চৈতন্যোদয় হলো। বলল, [illegible] এ কথা কোনোদিন আর ভুলব না। বলেই বৈঠকখানার [illegible] দিকে এগোতে থাকলো। আমার মনে হলো এ যেন ওর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে হেঁটে যাওয়া।

ছবি: সুফি

এঁদের লেখাও ভাল:

মন্দিরা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপল্লী, আসানসোল-৪ ॥
সুবর্ণ দেবনাথ, চরব্রহ্মনগর, নদীয়া-৭৪১৩০ ॥
বিশ্বপ্রসাদ মিত্র, কলকাতা-৫১ ॥
সৌরভ সরকার, জলপাইগুড়ি, ৭৩৫১০১ ॥
অনির্বাণ নাথ, হাওড়া, ৭১১১০৫ ॥
রামানুজ কোঁঙার, শক্তিগড়, ৭১৩১৪৯ ॥
পার্থপ্রতিম লোধ, আগরতলা, ত্রিপুরা ॥
স্বপ্না মুখোপাধ্যায়, বিক্রমনগর, হুগলী, ৭১২১০৩ ॥
শংকর চক্রবর্তী, কলকাতা-৮ ॥
মৈত্রেয়ী প্রধান, কাঁথি, মেদিনীপুর।
সুজিত বসাক, কলিকাতা-৩২ ॥
কৌশিক পালচৌধুরী, ভদ্রকালী, হুগলি ॥

জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন ঃ

১। নিজের সৃষ্টি সুরই একজন সুরকার শুনতে পেতেন না। তিনি কে?

২। ১৬৪২ সালে তাসমানিয়া আর নিউজিল্যান্ড কে আবিষ্কার করেন?

৩। কোন শহরে কত সালে প্রথম বাস সার্ভিস চালু হয়?

৪। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'জাম্প জেট' কি সত্যিই লাফিয়ে আকাশে ওঠে?

৫। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট বানর কি?

৬। মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখে কোন প্রাণী?

৭। কোন গ্রহ উল্টোদিকে ঘোরে?

৮। কোন ছিদ্রময় আগ্নেয়শিলা জলে ভাসে?

উত্তর ঃ

১। লুডউইগ ভন বেটোফেন। ৩০ বছর বয়স থেকেই তিনি শ্রবণশক্তি হারাতে থাকেন। তা সত্ত্বেও প্রায় বারো বছর তিনি জনসাধারণকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনান। তাঁর শেষ অনুষ্ঠান হয় ১৮১৪ সালে। এর ছয় বছর পর তিনি এতই বধির হয়ে যান যে চিৎকার করে কথা বললেও তিনি শুনতে পেতেন না। কিন্তু তার জন্য তাঁর সৃষ্টি থেমে থাকেনি। তাঁর অনেক বিখ্যাত সুর তিনি এ সময় রচনা করেন।

২। অ্যাবেল তাসমান।

৩। প্যারিসে ১৬৬২ সালে। বাসগুলো ছিল ঘোড়ায় টানা।

৪। 'জাম্প জেট' এক ধরনের ফাইটার প্লেন, নাম 'ভিটোল' (VTOL)। অন্য প্লেনের মতো আকাশে ওড়ার জন্য জাম্প জেটকে রানওয়ে ধরে ছুটে আসতে হয় না। এরা মাটি থেকে সোজা আকাশে উঠতে বা নামতে পারে। সেইজন্যই এদের জাম্প জেট বলা হয়। রানওয়ে ছাড়াই ওঠানামা করতে পারে বলে যুদ্ধের সময় প্লেনবহনকারী জাহাজে জাম্প জেট বেশি ব্যবহার করা হয়।

৫। পিগমি মারমোসেট। এই প্রজাতির বানর লম্বায় হয় মাত্র ১২ সেমি আর ওজন মাত্র ৭০ গ্রাম।

৬। স্লথ। এরা থাকে দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে। তাদের বড় আর বাঁকানো নখে গাছের ডাল ঠিক হুকের মতো আঁকড়ে তারা মাথা নিচের দিকে করে ঝুলে থাকে। আর এভাবেই খুব ধীর গতিতে চলাফেরা করে তাদের খাদ্য পাতা আর ফল খুঁজে বেড়ায়। স্লথদের লোমে শ্যাওলার আস্তরণ পড়ে বলে এদের রঙটাও সব সময় মনে হয় সবুজ।

৭। শুক্র। অন্য সব গ্রহ পশ্চিম থেকে পুব দিকে ঘোরে। শুক্র ঘোরে পুব থেকে পশ্চিমে। এই আবর্তন এতই আস্তে হয় যে তার অক্ষের চারদিকে একবার পাক খেতে শুক্রের সময় লাগে ২৪৩ দিন। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে তার এর চেয়ে কম সময় লাগে—২২৫ দিন।

৮। পিউমিস বা ঝামা পাথর।

ছবি–রাহুল মজুমদার

স্কুল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বিলির ঝামেলা আরো বেড়ে গেলো

বিলি ডেন এক জোড়া ছেঁড়া বুট খুঁজে পেয়েছিলো। বুটটা প্রাক্তন খেলোয়াড় ডেস সট কিনের। বুটটা পরে খেললেই বিলির খেলা একদম ডেড সটের মতো হয়ে যায়। কিন্তু বিলি তাদের স্কুল দল থেকে বাদ পড়লো। ওদিকে মুরফিল্ড অ্যাভিনিউ বিলিকে খেলাতে চাইছে। তারা এসে স্কুল ক্যাপ্টেনের কাছে খোঁজ খবর নিলো। স্কুল ক্যাপ্টেন বিলিকে কিছু বলতে চাইছে না....কিন্তু....

তুমি এসেছো বলে আমি খুব খুশি হয়েছি বিলি। সেদিন স্কুলে তোমার প্র্যাকটিশ আমার ভালো লেগেছে। তুমি কি আসছে শনিবার আমাদের মুরফিল্ড অ্যাভিনিউ সেকেন্ড দলের হয়ে খেলতে পারবে?

নিশ্চয়ই খেলবো মিঃ বেলাটন!

যাতে কোনো ঝামেলা না হয় তার জন্যে আমি তোমায় দিয়ে একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্মে সই করিয়ে রাখবো। শনিবার তিনটের সময় খেলা। আধঘন্টা আগে মাঠে এসো কেমন!

আমি ঠিক সময়ে এসে যাবো। ধন্যবাদ!

শুক্রবার রাত্তিরে বিলি ডেড সটের জীবনী নিয়ে বসলো....

ডেড সট এমন সুন্দরভাবে বডি সোয়ার্ভ করতেন যে তাঁর সঙ্গে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা পেরে উঠতো না।

কাঁধ আর কোমর ঘুরিয়ে তিনি প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের বোকা বানাতেন।

রাত্তিরে না ঘুমিয়ে বিলি পড়তে লাগলো....

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আর কোমর ঘুরিয়ে বাজিমাৎ করতেন ডেড সট! পড়তে যতোটা সহজ মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু ততোটা নয়....

কি করছিস বিলি? না ঘুমিয়ে ঘরে শুয়ে দুম-দাম করে কি করছিস?

আমি....আমি বডি সোয়ার্ভ প্র্যাকটিশ করছিলাম....

আমি শুয়ে পড়ছি ঠাক্‌মা। কাল খেলা, আমায় পুরোপুরি সুস্থ থাকতে হবে। তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্যে দুঃখিত।

আর পাগলামি করো না। এখন ঘুমোও!

ঘুমের ঘোরে....

আমি ওকে রুখতে পারছি না....ও দুরন্ত....

স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে গেলো বিলির....

ডেড সটের বুটটা কাল আমায় নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। ডেড সটের মতো বডি সোয়ার্ভ করিয়ে আমি সকলকে বোকা বানাবো....

কি হবে এবার? বিলি কি পারবে ডেড সটের মতো খেলতে? জানতে পারবে পরের সংখ্যায়!

জোজোর বায়না

আরতি বসু

কী ফ্যাসাদেই না পড়েছেন ডাঃ ডেভিড টেলর। নাওয়া খাওয়া ঘুম—সব মাথায় উঠেছে। কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না জোজোকে। ভোলানো যাচ্ছে না কিছুতেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হয়ে গেল এখনও সেই এক জেদ। নাস্তানাবুদ করে তুলেছে সবাইকে। এখন যদি কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায় তবে তো সমূহ বিপদ। চিড়িয়াখানায় কাজ করবার জন্যে আর লোকই পাওয়া যাবে না। ডেভিডের সব থেকে ভয় লেনকে নিয়ে। বেচারা বুড়ো মানুষ, আর কতক্ষণ সহ্য করতে পারবেন জোজোর অত্যাচার। অথচ তিনি-ই সবচাইতে বেশি ভালোবাসেন জোজোকে। হাসিমুখে ওর সব আবদার মেটান। ডেভিড এর আগে অনেকবার লেনকে সাবধান করে দিয়েছেন। লেন কানেই তোলেননি সে সব। বলেছেন, আর একটু বড় হতে দিন, দেখবেন ঠিক বুঝে যাবে। কিন্তু ও যে মোটেই বোঝাবার পাত্র নয় সেটা আজ ওর মাত্রাছাড়া বেয়াড়াপনা দেখে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন সবাই। কী বিদকুটে বায়না রে বাবা! খাবে না, ঘুমোবে না, কিচ্ছু করবে না, শুধু খেলবে! তাও আবার সুজির সঙ্গে নয়, খেলবে লেন, কিংবা ম্যাট কেলী, কিংবা রে লেগীর সঙ্গে! ডেভিডের সঙ্গে খেলতেও আপত্তি নেই। মোট কথা, কাউকে না কাউকে থাকতেই হবে ওর কাছে। জীবজন্তুর চিকিৎসা করে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন ডেভিড। এমন সমস্যায় পড়তে হয়নি কোনোদিন।

এত হৈচৈ হট্টগোল যাকে নিয়ে সেই জোজো হলো ম্যাঞ্চেস্টারের বেলভিউ চিড়িয়াখানার একটি পুরোদস্তুর জোয়ান গরিলা। তার পাশেই থাকে সুজি। জোজো আর সুজি এসেছিল নেহাৎ কচি বয়েসে। পাউন্ড দশেক ওজনের অসহায় দুটি শিশু। আসামাত্রই লেন ওদের দুজনকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন আদর করে। তখন থেকে লেন বলতে গেলে ওদের সঙ্গেই দিন কাটাচ্ছেন। কখনও খাবার তৈরি করছেন, কখনও মেপে মেপে ভিটামিন খাওয়াচ্ছেন, কখনও ওভালটিন গুলে রাখছেন রাতের জন্য। কাজেরও শেষ নেই, খবরদারিরও শেষ নেই। তার মধ্যে আবার ওদের নিয়ে খেলা করাও চাই রোজ অনেকক্ষণ ধরে। আদরে যত্নে জোজো সুজি দুজনেই খুব চটপট বড় হয়ে উঠতে লাগল। মেয়ে বলে বোধহয় সুজি ঠাণ্ডা, নম্র, বোঝদার। আর জোজো ঠিক তার উল্টো। ওর কেবল খেলার নেশা। আদর খাবার নেশাও খুব। কিন্তু কী আশ্চর্য সুজির সঙ্গে ও কিছুতেই খেলবে না। ও খেলবে লেনের সঙ্গে, নয়তো চিড়িয়াখানার প্রধান কর্মী ম্যাট কেলীর সঙ্গে, নয়তো খোদ ডিরেকটার রে লেগী কিংবা ডাক্তার ডেভিডের সঙ্গে।

খেলার ধরনটিও মন্দ নয়। ডিগবাজি খাওয়া, পায়ের মধ্যে পা বাধিয়ে উল্টে ফেলে দেওয়া, নয়তো মাথায় আলতো চাঁটি মেরে উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর হয়ে থাকা আর নয়তো সটান কোলে চড়ে বসে থাকা। ডেভিড জানেন যে গরিলার বাচ্চারা কোলে চড়ে আদর খেতে ভালবাসে। তা যতদিন জোজোর ওজন দশ-বিশ পাউন্ড ছিল ততদিন ওঁদেরও আপত্তি ছিল না।

[illegible] যে ওর ওজন সত্তর পাউন্ড ছাড়িয়ে গেছে। এখন [illegible] কোলে নিয়ে বসে থাকা যায়! জোজো কিছুতেই তা [illegible] না। ও কোলেই বসে থাকবে আর ওর বুকে পিঠে সুড়সুড়ি দিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া ওর খেলাচ্ছলে মারা চড়থাপ্পড়গুলো এখন হজম করা বেশ শক্ত। তবু ও খেলবেই। যেই কেউ ঢোকে ওর খাঁচার মধ্যে তাকেই পেয়ে বসে ও। কিছুতেই বেরুতে দেবে না। অনেক চালাকি করে কিংবা ঘুম পাড়িয়ে তবে বেরুতে হয়। তাও বেরুবার সময় প্রায়ই কাউকে না কাউকে খাঁচার ভেতরে রেখে আসতে হচ্ছে কয়েক গাছা চুল, নয়তো শার্টের হাতা কিংবা কোটের খানিকটা অংশ। এমন কি ঘুমোবার সময়ও শক্ত করে চেপে ধরে থাকে খেলার সঙ্গীকে।

লেনকে এখন বেশির ভাগ দিনই তাই ওর কাছে অনেক রাত অবধি থাকতে হয়। ব্যাপার-স্যাপার দেখে ইদানিং একটু অস্বস্তি হচ্ছিল ডেভিডের। লেনকে বলেওছেন সাবধান হতে। লেন হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। ব্যস, আজ একেবারে 'দেখে নেব' গোছের গোঁ ধরে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়েছে জোজো।

সকালে জোজো উঠছে না খাচ্ছে না শুনে ডেভিড গেছিলেন জোজোকে দেখতে। দেখলেন যত্ন করে। জোজোও চুপটি করে ছিল। তারপর যেই ডেভিড বেরুতে যাবেন ওর খাঁচা থেকে, বুঝতে পারলেন তাঁর হাতে জড়িয়ে থাকা জোজোর হাত দুখানা কী ভয়ঙ্কর শক্ত হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, দাঁত বার করে তাঁকে রীতিমত ভয় দেখাচ্ছে জোজো। বেগতিক দেখে লেনকে ডেকে ডাক্তার বললেন, সামলান আপনার জোজোকে। মতলব ভাল ঠেকছে না।

লেন একগাল হেসে বললেন, আপনি মিছিমিছি বড্ড ভাবেন ডাক্তার। এরকম একটু বায়না ও রোজই করে। চলুন আমি যাচ্ছি।

লেন খাঁচার মধ্যে ঢুকতেই জোজো ডেভিডকে ছেড়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। ডেভিড বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসে খানিকক্ষণ লক্ষ্য করলেন জোজোকে। লেন যাই বলুন ওর হাবভাবে আজ যেন শুধু ছেলেমানুষী নয়, একটা বন্য গরিলাসুলভ দৃঢ়তা আর জেদ দেখতে পাচ্ছেন তিনি। আজ ও সহজে রেহাই দেবে না কাউকে।

একটু পরে লেনও সেটা বুঝতে পারলেন। কাঁধের ওপর থেকে জোজোর হাত সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই সে প্রথমে পা চাপিয়ে দিল লেনের কাঁধে। তারপর সোজাসুজি কামড়েই ধরল। তবে এমন জোরে নয় যে কেটেকুটে দাঁত বসে যাবে। জোজোকে খুশি করার মতন খাবার-দাবার সর্বদাই থাকে লেনের পকেটে। একটা একটা করে সেগুলো বার করতে লাগলেন তিনি। এই নাও আঙুর, এই নাও কলা, এই নাও অ্যাপ্রিকট। এবার লক্ষ্মী হয়ে বোস তো সোনা, আমি যাই।

দাঁত বার করে গরগর করে উঠল জোজো। লেন তো অবাক। ঘাবড়েও গেলেন একটু। এ কী! এমন তো ও কোনোদিন করে না। খবর পেয়ে ডিরেক্টার রে লেগী এলেন। লেনকে বললেন,

দেব সাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকী

ছোটদের গল্পসঞ্চয়ন

ষাট বছর পর আবার

বই মেলায় বেরিয়েছে।

লেখক তালিকায় আছেনঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, জলধর সেন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রিয়ম্বদা দেবী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুখলতা রাও, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবিনয় রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রাধারাণী দেবী, সুনির্মল বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, হেমেন্দ্রলাল রায় এবং আরো অনেকে।

ছবি এঁকেছেনঃ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইবন্ধু রায় ও ফণিভূষণ গুপ্ত।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, ২১,ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

আমি যাচ্ছি জোজোর কাছে, আপনি বেরিয়ে আসুন। স্নান খাওয়া সেরে বিশ্রাম নিন। এবারও আপত্তি করল না জোজো, রে-কে পেয়ে লেনকে ছেড়ে দিল। ঘণ্টাখানেক কাটাবার পর রে দেখলেন জোজো ঘুমিয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে ওর হাতটা সরিয়ে ওঠবার চেষ্টা করতেই জোজোর নখ বসে গেল ওঁর পিঠে। ভাগ্যে কোটটা গায়ে ছিল! আরো আধঘণ্টা কাটল। তারপর ম্যাট কেলীকে ডেকে পাঠানো হলো। তিনি ঢুকতেই পোষা ভেড়ার মতো জোজো তাঁর কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বসে পড়ল মাটিতে। চিড়িয়াখানাময় ততক্ষণে রটে গেছে জোজোর কাণ্ডকারখানার কথা। উদ্বিগ্ন কর্মচারীদের ভিড় জমেছে তার খাঁচার বাইরে। ম্যাটকে ভেতরে রেখে রে বেরিয়ে এসে বললেন, চল আমরা সবাই এখান থেকে চলে যাই। ভিড় দেখলে জোজো আরও উত্তেজিত হয়ে উঠবে। ম্যাট একাই থাকুন ওর কাছে। মনে হয় আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

এদিকে ডেভিড তাঁর ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন আর মাঝে মাঝে খবর নিচ্ছেন। বিকেলের দিকে শুনলেন ম্যাট একবার জোজোর হাত ছাড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছিলেন বলে জোজো তাঁর শার্টের পকেট আর সবগুলো বোতাম ছিঁড়ে দিয়েছে। চুলও ছিঁড়েছে। নাঃ, যে ভাবে হোক ওকে ঘুমের ওষুধ দিতেই হবে। কিন্তু ইনজেকশন দিতে গেলে ও আরও রেগে উঠতে পারে, তাছাড়া ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগে সঙ্গীকে ধরে রাখার জন্য মারাত্মক কিছু করেও বসতে পারে। সুতরাং ইনজেকশন দেওয়া যাবে না। ডেভিড ও রে পরামর্শ করে ঠিক করলেন কলার মধ্যে ওষুধ ভরে খাওয়াবার চেষ্টা করবেন জোজোকে। টেলর একটা কলার মধ্যে ঘুমের ওষুধ ভরে দিলেন ইনজেকশন দিয়ে। সঙ্গে নিলেন ঠিক সেইরকম আর একটা কলা। প্রথমে সেটাই দিলেন জোজোকে। জোজো নির্বিবাদে কলাটা নিয়ে ছাড়িয়ে মুখে পুরে দিল। তখনও কিন্তু সে ম্যাটকে ছাড়েনি। এক হাতে তাঁর কানটা ধরে রেখেছিল। এবার ওষুধ-ভরা কলাটা এগিয়ে দিলেন টেলর। সেটাও নিল জোজো হাত বাড়িয়ে। খুশি হয়ে রে বলে উঠলেন, যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কতক্ষণ আর বাছাধন না খেয়ে থাকবে। কিন্তু পরক্ষণেই আতঙ্কে শিউরে উঠলেন দুজনে। জোজো যে খোসা ছাড়িয়ে কলাটা জোর করে গুঁজে দিচ্ছে ম্যাটের মুখে। সর্বনাশ! ডেভিড জানেন ঐ কড়া ওষুধ পেটে গেলে ম্যাট এক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন। শুধু তাই নয়, ওঁর সারা শরীরের জ্বলুনি সারতে লেগে যাবে অনেক দিন। চিৎকার করে উঠলেন ডেভিড, ম্যাট, ফেলে দাও কলা। শীগগির ফেলে দাও। জোজোর আদরে বিধ্বস্ত ম্যাট। কোনোমতে ফেলে দিলেন কলাটা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সবাই।

সন্ধ্যের পর আবার ডেকে আনা হলো লেনকে। ডেভিড বললেন, আপনার এই ছেলেকে বাগে আনার ক্ষমতা আমার অন্তত নেই। ভাবছি বইপত্র আর ডিগ্রিগুলো পুড়িয়েই ফেলব।

লেন একটু হেসে বললেন, আপনি একটা জিনিস বুঝছেন না ডাক্তার, ছেলেবেলায় খেলাধুলো করতে কি আমরাই কম ভালবাসতাম। পড়া ফেলে, খাওয়া ফেলে কি কোনোদিন পালিয়ে যাননি খেলতে? তাহলে ওর ওপর এত জুলুম কেন? তবে হ্যাঁ, ওকে বোঝাতে হবে যে ও বড় হয়েছে, তার জন্যে দরকার হলে শাস্তি একটু দিতে হবে বৈকি। আপনারা যান, শুধু এখানে একটা চেয়ার আর একটা ট্রানজিস্টার রেডিও পাঠিয়ে দিন।

লেনের কথামতো সবাই চলে গেলেন সেখান থেকে। শুধু মাঝরাতে রে একবার গিয়ে দেখে এলেন জোজো ঠিক একভাবে বসে আছে লেনকে জড়িয়ে। রেডিওতে বাজছে সুন্দর একটা মিষ্টি গান। পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়ল জোজো। নিশ্চিন্ত গভীর ঘুম। ওকে সাবধানে কোল থেকে নামিয়ে মাটিতে শুইয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলেন লেন।

তারপর অনেকদিন আর জোজোর কাছে যায়নি কেউ। একা থাকতে থাকতে জোজো শান্ত হয়ে গেল, ভাব হলো সুজির সঙ্গে। দূর থেকে তাদের দেখতেন লেন। দেখতেন কেমন একটু একটু করে তাঁর আদরের জোজো বড় হয়ে উঠছে।

জোজোকে নিয়ে আর কোনো হট্টগোল হয়নি কখনো। কিন্তু যখনই ডেভিড, রে, ম্যাট আর লেন একসঙ্গে বসে গল্পগুজব করতেন তখনই উঠত জোজোর কথা। সেই সব ছেলেমানুষী দুষ্টুমির কথা ভেবে তাঁদের ভীষণ মন কেমন করত। খেলা করতে কী ভালই না বাসত জোজো! কেন যে সবাইকে বড় হতে হয়! কেন যে ছোটবেলাটা ফুরিয়ে যায় এত তাড়াতাড়ি!

[ডাঃ ডেভিড টেলর-এর 'জু ডেট. অ্যাডভেঞ্চার্স অফ এ ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল ডক্টর' অবলম্বনে।]

ছবি : সৌমিত্র চক্রবর্তী

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং রামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

বই মেলায় বেরুলো

নিউ বেঙ্গলের সাহিত্য সম্ভার

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিদেশিনী

অগ্নিমিত্রর
দেশ থেকে দেশান্তর

ডঃ দীপক চন্দ্রর
হরিবংশ

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের **ক্রিকেট মাঠের বাইরে**

ক্রিকেট মাঠের বাইরে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। নেপথ্যে সেই সব ঘটনা খেলোয়াড়দের জীবনকে হাসি-কান্নার দোলায় দুলিয়ে দেয়। গল্প উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর সেই সব কাহিনী নিয়ে এই প্রথম বাংলায় একটি বই বেরুলো।

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যর
পেরুতে সূর্য লাল

দিলীপ ভট্টাচার্যর
প্রবাস প্রেম

আভা বসুর
সাগর দুহিতা

দেবনারায়ণ গুপ্তর
বাংলার নট-নটী

শতদল ভট্টাচার্যর
নিশুতি রাতের মহাত্মা

ময়ূখ চৌধুরীর
দেবী দর্শন

ডাঃ কল্যাণ চক্রবর্তীর
বিপন্ন প্রকৃতি

রাধারমণ রায়ের
অদ্ভুত গোয়েন্দা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
(নতুন সংস্করণ)

ক্রিকেট খেলার আইন কানুন
ফুটবল খেলার আইন কানুন
ফুটবল ক্রিকেটের আইন

দীপঙ্কর বিশ্বাসের
মজানো দশ

অরুণ সর্দারের
অনাহূত

আশুতোষ মন্ডলের
নতুন আলো

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, ৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

Registration No. W. B./E. C.—60 May '93 "Suktara"

চুল নিয়ে সমস্যা ?
চুল পড়া ? অকালপক্কতা ? খুস্কি ?

ডাঃ সরকার বলেন—

চুলের কোনও রোগই নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র। তাই শুধু মাথায় ওষুধ লাগালেই হবে না সঙ্গে ওষুধ খেতেও হবে।

খুস্কি বিহীন, ঘন, কালো, মসৃণ চুল যদি চান,
আর্ণিকাপ্লাস লাগান আর ট্রায়োফার খান।
এ দুটি চুল পড়া বন্ধকরে, চুলের পুষ্টি জোগায়,
অকালপক্কতা রোধ করে, মাথার খুস্কি তাড়ায়।
মাথা ঠাণ্ডা রাখে, পেটের গোলমাল সারায়,
চুলের উপাদান বাড়ায়, তাই নতুন চুল গজায়।
রূপ হয় অপরূপ হোমিওপ্যাথির ছোঁয়ায়,
আর সুফল ছাড়া, কোনও কুফল না হয়।

বিশ্বে সর্বপ্রথম

কেশ সমস্যা সমাধানে

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার (সি,সি, আই-পুরস্কৃত) ট্রায়োফার খাওয়ার সঙ্গে আর্ণিকাপ্লাস লাগানোর ওষুধ।

ব্যবহার বিধি ঃ

আর্ণিকাপ্লাস-হেয়ার ভাইট্যালাইজার স্নানের পরে ও রাতে শোয়ার আগে চুলের গোড়ায় লাগান, সঙ্গে ট্রায়োফার-হেয়ার টনিকটিও-সেবন করুন সকালে ও রাত্রে, যত দিন না চুল নিয়ে সমস্যা দূর হয়।

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

ট্রিপ্ল অ্যাক্শন হেয়ার ভাইট্যালাইজার
কেশ সমস্যা সমাধানে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত
হোমিও ওষুধ

প্রস্তুতকারক ঃ ফোন ৩৫-২৯৬১
এ্যালেন ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ
এ্যালেন হাউস ঃ ২২৪/এইচ, মানিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪

বিপণন সংস্থা ঃ ফোন-৫৯-৪০৫১
অ্যালেন্স ইণ্ডিয়া মার্কেটিং প্রাঃ লিঃ
আর্ণিকাপ্লাস অ্যাপার্টমেন্ট, শিয়ালদহ
৩৫, এ. পি. সি. রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

Allopathic, Ayurvedic & Homoeopathic Medicine Manufacturers

Bringing Science To Life

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা। **Dr. SARKAR Group**

Allen's Ad. India